আজি মিলন রাত্রি

ঊষা দেবী সরস্বতী

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী, ১০ই মাঘ, ১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীকিরীটিকুমার পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
ব্লক সি, রুম ৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮/৪এ, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদচিত্র
শিল্পী অজিত গুপ্ত

পরিকল্পনা
শ্রীসত্যনারায়ণ দে

নিয়ন্ত্রণ
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত

AJI MILAN RATRI
A Novel
by Usha Devi Saraswati

উৎসর্গ

স্বর্গগতা মাতৃদেবীর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূর্য-সারথির রথ চলেছে। পূব-আকাশে সোনালী আলোর জোয়ার এসেছে। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ।

সুশ্বেতা তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসলো।

এলোমেলো শাড়ীটা গুছিয়ে বিছানা ছেড়ে জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো সে, শান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো।

ভোরের স্নিগ্ধ আলোর মাঝে ওর মন যেন মিশে গেল কোন্ সুদূরে।

একইভাবে তাকিয়ে আছে সে।

সমস্ত জায়গাটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, ছাড়া-ছাড়া। আর চারপাশে কত আলো! সেই নানারঙের আলোয় যেন তলিয়ে যাচ্ছে সুশ্বেতা।

কেমন একটা বিষন্নতা এই আলোয় ছড়িয়ে আছে। এই নির্জনতার মাঝে বাতাসে গাছের পাতায় পাতায়-মর্মর ধ্বনি জাগছে। সেই সুরে বুকের মধ্যে কেমন কান্না গুমরে উঠছে তার।

কীসের এ কান্না? সুশ্বেতার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

মনে পড়ে কত কথা।

সে কি শুধুই কথা? না অন্তর নিংড়ানো অশ্রুজল?

কেন, সুশ্বেতার তো কোনো দুঃখই নেই ! সুন্দর শান্তিপূর্ণ সংসারে আশ্রয় পেয়েছে সে ! ছোট পরিবার। ছেলে-মেয়েরা এখানে থাকে না, দূরে কোথায় পড়াশোনা করে। কর্তা-গিন্নী ওকে মেয়ের মতই স্নেহ করেন !

কিন্তু তবুও মন তৃপ্ত হয় না কেন ? এর চেয়ে বেশী কিছু চাওয়ার আশা করা কি তার উচিত ?

এখানে আশ্রয় পেয়েই তো সুশ্বেতা মানুষের মত আজও বেঁচে রয়েছে ! এ ভাবে বেঁচে থাকার কি সত্যিকারের কোনো প্রয়োজন ছিল ?

সুশ্বেতার জীবন একটা ইতিহাস। এ ইতিহাসের পাতায়-পাতায় অশ্রুজলের দাগ শুকিয়ে আছে !

দেশ ভাগ হওয়ার পর মা-বাবাকে হারিয়ে সুশ্বেতা জ্ঞাতিকাকা হরেনবাবুর সঙ্গে কলকাতার দিকে রওনা হলো।

ষ্টেশনে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী আসার একটু দেরী আছে ! ষ্টেশনে দাঁড়াবার মত স্থানটুকুও নেই। সুশ্বেতার রূপ কতকগুলো দুষ্ট লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সেই সৌন্দর্য ওদের মনে কামনার আগুন জ্বালিয়ে ছিল !

ওরা এসে হরেনকাকাকে বললে—আপনি কি টিকিট করেছেন ? না করে থাকলে চলুন আমাদের সঙ্গে। ভয় নেই, আমরা সেবাব্রতী সংঘের লোক !

সহজ সরল মানুষ হরেনকাকা ওদের কথায় বিশ্বাস করলেন ! যদি এই ভিড়ে সাহায্য পাওয়া যায় তো ভালোই হয় !

লোকগুলো ওদের একটু ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে হরেনকাকাকে বললে—আমাদের সঙ্গে টিকিট করতে যাবেন, বলুন।

ভালোমানুষ হরেনকাকা জীবনে অবিশ্বাস কাউকেই করেননি ! আজও করলেন না। ওদের সঙ্গে তিনি চলে গেলেন। ষ্টেশনে পড়ে রইলো একটি অসহায় পরিবার।

আশ্চর্য ! সেদিন কিন্তু ওরাও বুঝতে পারেনি যে, এরূপ ভদ্র যুবকেরা এত খারাপ হতে পারে !

ঘণ্টাখানেক পরে একজন যুবক এসে বললে—দেখুন, উনি ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞানের মত হয়ে গেছেন। কাছে একটা হাসপাতালে ওঁকে নিয়ে গিয়েছি আমরা।

শুনেই কেঁপে উঠলো সুশ্বেতা। আড়ষ্ট গলায় কোনোরকমে বললে—আমরাও কি হাসপাতালে যাবো ?

—না, সবাই গেলে মনে হয় ভালো হবে না। বরং আপনিই চলুন। উনি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে একটু বসবেন না হয়।

সুশ্বেতা দৃঢ়কণ্ঠে বললে—না, আমরা সবাই যাবো।

এমন সময় আর-একটি যুবক ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বললে—ভদ্রলোকের অবস্থা খারাপ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

তখন সুশ্বেতা নিজেকে হারিয়ে ফেললো। সে দ্রুতপায়ে কাকীমাকে নিয়ে ওদের সঙ্গে চললো।

সামনেই ট্যাক্সি ছিল। সুশ্বেতা প্রথমে উঠলো। কাকীমা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ওঠাবার আগেই ট্যাক্সিটা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চললো।

সুশ্বেতা আর্তনাদ করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ হাত দিয়ে কে যেন তার মুখটা সজোরে চেপে ধরলো। তারপর আর সুশ্বেতার কিছুই মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দেখতে পেলে একটা ঘরে সে একা। ঘরটা অন্ধকার। ছাদ ঘেঁসে একটা ছোট্ট জানলার মত একটু শুধু আলো দেখা যাচ্ছে।

সুশ্বেতা কেঁপে উঠলো। এ কোথায় এলো সে ? কোথায় গেলেন হারুকাকা ? তাকে ফেলে কি কাকীমাও চলে গেলেন ? মিলু, দাপু আর খোকন ? ওরাও চলে গেছে ?

আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো সুশ্বেতা।

—শ্বেতা !—ডাক শুনে চমকে উঠলো সুশ্বেতা।

ওঃ, এতটা বেলা হয়েছে! মনে মনে লজ্জিত হলো সুশ্বেতা। বাড়ীতে অনেক কাজ। আর সে কিনা এখন দাঁড়িয়ে কত কি ভেবেই চলেছে ? এ ভাবনার কি আর শেষ আছে ?

আজ তাঁদের একমাত্র মেয়ে স্বপ্না আসবে। ওর সঙ্গে ওর কয়েকজন বান্ধবীও আসবে।

—এই যে মাসীমা !—বলে সুশ্বেতা তাড়াতাড়ি বাইরে এলো।

মন্দাকিনী বললেন—যাও, স্নানটা সেরে এসো · অত তাড়াহুড়ো করতে হবে না।

সুশ্বেতা বাথরুমের দিকে চলে গেল! মন্দাকিনী ওর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন ফুলের মত সুন্দর মেয়ে! আর তার ভাগ্য কী বিড়ম্বিত।

স্বপ্না সুশ্বেতাকে দেখেনি। ওর বিষয় ওকে কিছু জানাননি মন্দাকিনী। স্বপ্না বড় জেদী মেয়ে। যা বলবে, তা ও করবেই।

স্নান সেরে এসে দাঁড়ালো সুশ্বেতা। কালো কোঁকড়ানো চুলের-ঢেউ সারা পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুগৌর গায়ের রঙ। টানা টানা সুন্দর দুটি চোখে মায়ার কাজল আঁকা।

মন্দাকিনী ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মনে মনে ভাবেন, সুশ্বেতাকে দেখে কি কেউ কোনোদিন রাগ করতে পারে!

কিন্তু তিনি নিজেও কি প্রথম দিন ওর কথা শুনে স্বামীর ওপর রেগে ওঠেননি ?

একদিন অফিস থেকে ফিরেই নির্মলবাবু স্ত্রীকে বললেন—মন্দা, তোমাকে একটা অনুরোধ করবো। বলো, রাখবে ?

—কি তোমার অনুরোধ ?

—একটি সত্যিকারের দুঃখী মেয়েকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে।

—আশ্রয়! কি বলছো তুমি !—চমকে উঠেছিলেন মন্দাকিনী।

নির্মলবাবু বললেন—মেয়েটি সত্যই বড় দুর্ভাগিনী। বড়ঘরের মেয়ে। সব কিছুই হারিয়ে সে আজ কাঙালিনী। শুনেছি মেয়েটি নাকি সুন্দরী ওর রূপই ওকে বিপদের মুখে টেনে এনেছে।

—তুমি ছাড়া কি সেই সুন্দরীকে আশ্রয় দেবার কেউ নেই। এতদিন ছিল কোথায় ?

—নারী কল্যাণ আশ্রমে।

—সে আশ্রমে স্থান হলো না ?

—সে আশ্রমও খুব নিরাপদ নয় মন্দা।

—বলি হ্যাঁগা, বুড়ো বয়সে কি তোমায় ভীমরথীতে ধরলো ? ওই সুন্দরীকে এনে আমি রাখি, আর আমার সোনার সংসারে আগুন লাগুক।

না, না। কোনো আপত্তি করো না মন্দা। তুমিও তো মা, মা হয়ে আর একটি দুঃখী মেয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারো না আমি যে ভদ্রলোককে একরকম কথা দিয়েছি।

একটু থামলেন নির্মলবাবু। কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে লাগলেন—তোমার সংসারেও তো একটি লোকের দরকার। মেয়েটি না হয় তোমার দাসী হয়েই থাকবে।

মন্দাকিনী আর কোনো কথা বলেননি সেদিন। তারপর একদিন সুশ্বেতা এলো। ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মন্দাকিনী।

বিকেলের দিকে স্বপ্না এলো। সঙ্গে রমা ও অমিতা। সুশ্বেতাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল স্বপ্না। মাকে জিজ্ঞাসা করলো—এ কে মা ? আগে তো কখনো দেখিনি।

—ও একটি অনাথা মেয়ে। আশ্রয় নেই কোথাও। তোর বাবা মেয়েটিকে দয়া করে স্থান দিয়েছেন।

স্বপ্না ঠোঁট উল্টিয়ে বললে—ও, তাই বুঝি !

মেয়ের এটুকু কথার মধ্যে যে তাচ্ছিল্য ভাব রয়েছে, সেটা মন্দাকিনী বুঝতে পারলেন।

স্বপ্না বান্ধবীদের নিয়ে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। ওরা তিনজনে আজ নদীতে বেড়িয়ে এলো। নৌকা-চালকের ভঙ্গীতে ফটো তুলেছে তিন বান্ধবী।

শ্যাম্পু-করা চুল আর উগ্র প্রসাধন-করা মুখে কোনো সৌন্দর্য খুঁজে পান না মন্দাকিনী।

ওদের পাশে কালো পাড়ের সাদা মিলের শাড়ী ও নীল পপলিনের জামা-পরা সুশ্বেতাকে অনেক বেশী ভালো লাগে দেখতে। সুশ্বেতার উগ্রতা নেই, সারা গায়ে লাবণির ঢেউ দুলছে।

সেদিন···কাজের শেষে নিজের ঘরে ফিরে এলো সুশ্বেতা।

ঘরটা খুবই ছোট এবং বেশ নির্জন। ভাঁড়ারের কিছু কিছু জিনিসও এঘরে আছে! একপাশে দেওয়াল ঘেঁসে একটা তক্তপোষ পাতা। কাছেই জানলা। এখানে শুয়ে শুয়ে গোটা পৃথিবীটাই যেন দেখতে পায় সুশ্বেতা! দিনের শেষে এখানে এসে যেন নিজেকে খুঁজে পায় সে। পৃথিবীর সীমাহীনতার মাঝখানে শুধু সে যেন একাকী শ্রান্তিহীন যাত্রীর মত। জীবন তার নিঃস্ব। তবুও তার অতীতকে ভাবতে ভালো লাগে। দুঃখ ও বেদনার মধ্যে অতীতকে নতুন করে পাওয়ার যে সুখ, সুশ্বেতা তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে। আজও সে বিছানায় বিছিয়ে দিলে নিজেকে।

রাতও অনেকটা হয়েছে। তাকিয়ে দেখলো, আকাশে তখন ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ আর সলজ্জ চাঁদের লুকোচুরি খেলা সুরু হয়েছে।

দোতলার বড় ঘর থেকে হাসির তরঙ্গ শোনা যাচ্ছে। স্বপ্না, অমিতা আর রমা হাসছে। গল্প করছে।

ওরা কত সুখী! আর সুশ্বেতা?

আজ আবার এ প্রশ্ন কেন তার মনে জাগছে? একি ঈর্ষা?

না, না। সে কাউকেই ঈর্ষা করে না।

সুশ্বেতার মনের দৃষ্টি চলে যায় দূরে····বহু দূরে···অতীত এসে সামনে দাঁড়ায়।

*

*   *

ঘন সবুজের আড়ালে ঢাকা পদ্মাতীরের একটি গ্রাম। কত সুখ ও শান্তির খনি লুকিয়ে ছিল সেখানে।

বাবা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর সুনাম ছিল যথেষ্ট। আশেপাশের গ্রাম থেকে কত ছেলেমেয়ে বাবার কাছে পড়তে আসতো। কারোর কাছ থেকে কোনো অর্থ নিতেন না তিনি। অর্থের প্রতি তাঁর লোভও ছিল না।

সংসারের অভাব-অভিযোগকে তিনি মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। কখনো কখনো মা রাগ করে বলতেন, তুমি যদি এমন নির্লিপ্ত উদাসীন হও, তাহলে কি করে সংসার চলবে ?

তাঁর মুখে মাধুরী মেশানো হাসি ফুটে উঠতো। তিনি বলতেন স্ত্রীকে—কেন মালতী, তোমার সংসার কি চলছে না? বেশ তো সুখে দিন কাটছে আমাদের।

চলছে ঠিকই। কিন্তু একে কি আর চলা বলে ?

সুশ্বেতার বাবা চুপ করে থাকতেন। মা-ও আর কথা বাড়াতেন না। কারণ তিনি ভালো খুব ভালো করেই জানেন যে তাঁর স্বামী ভোলানাথ। সংসার নির্লিপ্ত সদাশিব পুরুষ।

বড় হয়ে সুশ্বেতা বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। মায়ের জীবনে স্বচ্ছলতা কোনোদিনই আসেনি। জীবনে এমন কত ঘটনাই তো আকস্মিকভাবে ঘটে যায়, সারা জীবন চেষ্টা করলেও মানুষ তা ভুলতে পারে না।

মানুষের জীবনে যা কিছু কামনার, সবই তো পেয়েছিল সুশ্বেতা। বিধাতা দু'হাত উজাড় করে দিয়েছিলেন, আবার তিনিই বুঝি সব কেড়ে নিলেন।

দেশ ভাগ হওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে অনেকেই চলে গেল। কিন্তু

সুশ্বেতারা যাবে কোথায়? এতবড় মেয়ে নিয়ে কার কাছে যাবে? মালতীর অভিমানী মন বেদনায় ভরে ওঠে।

একদিন রাতের আঁধারে এলো কমলমাঝি, চাপাগলায় বললে কর্তা! ও কর্তাবাবু।

উঃ! অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন শিবকালীবাবু।

—একটা কথা আছিলো আমার, আইগ্যা।

—কি কথা, বলো।

—আইজ নৌকা কইরা আমি আপনাগো ষ্টীমারে উঠাইয়া দিমু। হরেন কর্তাবাবুও পোলা-মাইয়া লইয়া যাইবেন। আপনি আর একা থাইক্যা কি করবেন কর্তা!

শিবকালীবাবু কোনো কথা বললেন না।

সেইদিনই শেষ রাতে কমলমাঝি তাদের সবাইকে নিয়ে নৌকা ছাড়লো।

নৌকা চলছে তরতর করে প্রমত্তা পদ্মার বুকের ওপর দিয়ে. চারদিকে শুধু জল আর জল।

হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। সমস্ত প্রকৃতি যেন থমথম করছে। কীসের যেন একটা অব্যক্ত বেদনা হু হু করে কেঁদে কেঁদে উঠছে। অন্ধকারে ভীষণাকৃতি কে যেন কার প্রতীক্ষায় বসে আসে। নিঝুমতা আরো গাঢ় আরো উৎকট হয়ে উঠলো। সহসা শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইতে লাগলো। এলোমেলো হাওয়া। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো।

ঝড়-বৃষ্টির সে কী ভয়ঙ্কর উদ্দামতা নৌকা পাক খেয়ে তলিয়ে যেতে লাগলো। কমলমাঝি হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার'! বলে প্রাণপণে তীরের দিকে নৌকাটাকে চালিয়ে যেতে লাগলো।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল খেয়াল নেই। একসময় সুশ্বেতার মনে হলো যেন সমস্ত পৃথিবী দুলছে।

তারপর আর কিছুই জানে না সে।

সকলেরই জীবন রক্ষা করেছিল সেদিন পদ্মাতীরের মাঝির দল, কিন্তু বাঁচাতে তারা পারেনি শুধু একজনকে। তিনি সুশ্বেতার বাবা। ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে তিনি কোন্ অতলে যে তলিয়ে গেলেন, কেউ তাঁকে খুঁজে পেলে না।

এদিকে মালতীর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক! জ্ঞান ফিরতেই কমলমাঝিকে ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—মাঝি! তোমার কর্তাবাবু কোথায়?

নতমুখে কমলমাঝি বলেছে—কর্তাবাবু পাছু নায়ে আসছেন মাঠাইরেণ!

সহসা মালতী দাঁতে দাঁত চেপে রূঢ়কণ্ঠে বললেন—সত্যিকথা বলো মাঝি, তোমার কি কোনো কু-মতলব আছে? আমি কি কিছু বুঝতে পারিনি মনে করেছো?

শিশুর মত কেঁদে উঠলো কমলমাঝি! বললে—মাঠাইরেন গো, জান দিয়াও কর্তারে বাঁচাইতে পারলাম না! অপরাধ লইবেন না, চিরকাল আপনাগো লবণ খাইছি, নেমকহারামি করুম না। ওই রাক্ষসী পদ্মাই তাঁরে খাইয়া ফেলাইলো।

মালতীর চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। এ কী বলছে মাঝি? তিনি নেই। একি কখনো সম্ভব হতে পারে?

মালতী মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন! সুশ্বেতা ভীষণ ভয় পেয়ে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে আর্তকণ্ঠে ডাকলো—মা! মা! মাগো—

কেউ সাড়া দিলে না।

এ ভাবে সাতদিন কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন চীৎকার করে মালতী বসলেন। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে কি যেন খুঁজছেন। সুশ্বেতাকে কাছে টেনে এনে বললেন খুকু! তোর বাবা যে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বসতে বল্। যাবো, আমিও যাবো—

আবার কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়লেন মালতী। শেষ রাতের দিকে আবার প্রলাপ বকেন—বাঁচাও ওগো বাঁচাও আমাদের—

মাথাটা একপাশে ঢলে পড়লো। ক্যাম্পের মাটিতে-পাতা বিছানায় শেষ নিশ্বাস ফেললেন মালতী—সুশ্বেতার মমতাময়ী মা।

সাত দিনের মধ্যে সর্বস্ব হারিয়ে সুশ্বেতাকে পথে এসে দাঁড়াতে হলো।

ঢং ঢং করে শব্দ হলো দুটো।

সহসা কে যেন বললে—সুশ্বেতা, দুঃখ তোমার অনন্তকালের। চিরকালই তোমার এ দীর্ঘশ্বাস আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াবে।

সুশ্বেতা চমকে উঠলো। তার জীবনে সুখ নেই—দুঃখও নেই, আছে শুধু অভ্যাসের মায়া।

দিন আর রাত। সূর্য ওঠা আর রাত আঁধার হওয়া। কোনো আঁচড়ই কাটে না জীবনে।

বাইরে অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে। সামনের কদমগাছটার মাথায় অনেকগুলো তারার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো সুশ্বেতা।

*

* *

আজ ওরা কলকাতা ফিরে যাবে। অমিতা আর রমা। মন্দাকিনী ওদের আরো কয়েকটা দিন থেকে যেতে বললেন।

স্বপ্না বললে—মা যখন বলেছেন, সুতরাং যাওয়া তোমাদের কোনোমতেই চলবে না।

অমিতা ও রমা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো—থাকতে পারি আমরা, তবে একটা সর্তে।

—কি সর্ত ?

—যদি স্বপ্না আমাদের ওখানে অনেকদিন থাকে।

—অনেকদিন? তার মানে?

—অর্থাৎ যতদিন ওকে আমরা ছেড়ে না দিই।

এবারে স্বপ্না খিল খিল করে হেসে উঠলো। মন্দাকিনীও হাসলেন।

এমন সময় নির্মলবাবু সেখানে এলেন। তাঁর হাতে একটা হালকা হলদে রঙের খাম।

মন্দাকিনী চমকে উঠলেন। কীসের টেলিগ্রাম আবার এলো এখন? অজানা আতঙ্কে বুকটা কেঁপে ওঠে।

ভয় নেই, ভালো খবর। খোকা আসছে আজ।—নির্মলবাবু বললেন।

—দাদা! দাদা আসছেন আজ! ওঃ, কী আনন্দই না হবে!—স্বপ্না ছোট মেয়ের মত খুশীতে উছলে উঠলো।

ওর দিকে তাকিয়ে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

মন্দাকিনী উঠলেন। আজ তিনি নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে ভালো-মন্দ অনেক কিছুই রান্না করলেন।

সুশ্বেতা হাতের কাছে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

একসময় মন্দাকিনী সুশ্বেতাকে বললেন—হ্যাঁরে শ্বেতা, এখনও সেই একইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্? আশ্চর্য মেয়ে কিন্তু তুই। যা মা, গা-টা ধুয়ে চুলগুলো বাঁধ্‌গে।

—এই যে যাচ্ছি। চপগুলো কি গড়ে রাখবো মাসীমা?

—না, থাক এখন। ভাজবো তো সেই রাত্তিরে।

সুশ্বেতা চলে যাচ্ছিল। মন্দাকিনী ডাকলেন—শোন্ শ্বেতা!

সুশ্বেতা এলো। তিনি ওকে একেবারে বুকের কাছটিতে টেনে নিয়ে বললেন—তোকে তো আমি মেয়ের মতই ভালোবাসি। তবুও কেন তুই এত ভয়ে ভয়ে আর দূরে দূরে থাকিস্ বল্ তো?

সুশ্বেতার সুন্দর বড় বড় চোখদুটিতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু টলমল করে ওঠে। মুখে কোনো কথাই বলতে পারে না। শুধু ঠোঁট দুখানা থর থর করে কাঁপে।

হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দে সুশ্বেতার চিন্তালগ্ন মনের চমক ভেঙে যায়। দেখলো, স্বপ্না এসে মন্দাকিনীর পাশে দাঁড়িয়েছে।

স্বপ্না ডাকলো মা!

মন্দাকিনী মুখটা এদিকে ফিরিয়ে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললেন—আমায় কিছু বলবি খুকু?

—আমি একটু রাণুদের বাড়ী ঘুরে আসবো?

—বেশ তো। একাই যাবি?

—না। অমিতা আর রমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

মন্দাকিনী প্রশ্ন করলেন—অনুপ কি এসেছে?

—জানি না, তবে রাণুর কাছে আসার কথা শুনেছিলাম।—বলেই স্বপ্না চলে গেল সেখান থেকে।

অনুপ রাণুর দাদা। রাউলকেল্লাতে কাজ করে। এ-দুটি বাড়ীর হৃদ্যতা বহুদিনের।

মন্দাকিনী উঠলেন। সুশ্বেতাও উঠে এসে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করলো।

নিজেকে সবার আড়ালে রাখে সুশ্বেতা।

শ্যামল এসেছে। ওর সামনে কখনও বেরোয়নি সে। তাছাড়া প্রয়োজনই বা কি? রান্নাবান্না হয়ে গেলে নিজের ছোট ঘরখানিতে বসে থাকে সে। এ-ই তার জগৎ। সে যে আশ্রিতা—একথা সুশ্বেতা কোনো সময়েই ভুলে যায় না। কিন্তু স্বপ্না যেন সুশ্বেতাকে এড়িয়ে চলে। কথাও বলে না তার সঙ্গে।

সেদিন রাতে সুশ্বেতা রান্না করছে। কড়াতে ফোড়নটা ছেড়ে দিয়ে ডালটা ঢেলে দিতেই টগ্‌ বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টিগন্ধ রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়লো।

গনগনে আগুনের আঁচে সুশ্বেতার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। শুভ্র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ঘন জামরঙের সাধারণ শাড়ীখানা ওর শাঁখ-সাদা দেহটিকে ঘিরে রয়েছে।

বাড়ীটা নিঝুম। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা।

ওরা সবাই হয়তো বেড়াতে গেছে। মাসীমা এসময় প্রায়ই ঠাকুরঘরে থাকেন। ঠাকুরের বৈকালী দেন তিনি। মেসোমশাই বোধহয় কোনো কাজে বেরিয়েছেন। সুশ্বেতা একা। হাঁটুর ওপর থুঁতনি রেখে সে একমনে ফুটন্ত ডালের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাড়ের ওপর হেলে পড়েছে মস্তবড় খোঁপা।

'মা! মা!' বলে ডাকতে ডাকতে শ্যামল রান্নাঘরে ঢুকেই সুশ্বেতাকে দেখে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

শ্যামলকে দেখে উঠে দাঁড়ালো সুশ্বেতা। শ্যামলের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো সে। বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগলো। নিমেষে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে গেল। ডালের কড়াটা উনুন থেকে নামিয়ে একেবারে নিজের ঘরে চলে এলো সে।

শ্যামলের মনে হলো একটা বিদ্যুৎ যেন অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল।

রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। সুশ্বেতা নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো। বারবার কেবলই মনের আকাশে ভেসে উঠছে দুটি চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি। আর মনে পড়ছে অতীতের কত কথা।

যেদিন মিথ্যাকথা বলে হারুকাকার কাছ থেকে সেই ভদ্রবেশী পশুর দল গাড়ী করে তাকে একটা ছোট ঘরে রেখে দিয়ে গেল, সেই ভীষণ দিনটির কথা মনে পড়লে এখনও সুশ্বেতার বুক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। সেদিন শুধু সে অসহায়ভাবে কেঁদেছিল। সে-কান্নার দর্শক কেউ তখন সেখানে ছিল না। কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মনে নেই। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে সুশ্বেতা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো।

বুড়ী ক্ষেত্রমণি বলছে—আহা! কোন্ মায়ের বুক খালি করে ছিনিয়ে এনেছে শয়তানরা!

সুশ্বেতা ক্ষেত্রমণির পা-দুটো জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো—ও মাগো, তুমি আমায় বাঁচাও। আমার জীবন-মরণ, মান-সম্মান সব কিছুই এখন তোমার হাতে।

ক্ষেত্রমণি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। সুশ্বেতার বুক-কাটা কান্নায় মনে আঘাত পেলো। তার কোটরগত চোখদুটি জলে ভরে উঠলো।

বুড়ো হয়েছে ক্ষেত্রমণি। ছেলে আর ছেলের বৌয়েরা খেতে দেয় না। ভিক্ষে করেও পেট চলে না। তাই মাঝে মাঝে বুড়ীকে এরা এ ধরনের কাজ করিয়ে মোটা টাকা পারিশ্রমিক দেয়।

ক্ষেত্রমণিকে ওরা খুব বিশ্বাস করে। আর এ-কাজ যে ভালো নয়, তা ক্ষেত্রমণি বোঝে। কিন্তু উপায়ই বা কি! পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা! ভাবে, এ কি পাপ?

হ্যাঁ, পাপ বৈকি। নিজে না করলেও পাপ-কাজে সাহায্য করাও তো পাপ।

ক্ষেত্রমণির হৃদ্‌পিণ্ডটা কে যেন সজোরে চেপে ধরলো।

ধীরে ধীরে সুশ্বেতার দিকে তাকালো। অমন সুন্দর ফুলের মত মেয়ে। কাল এসে ওরা কি করবে, সে ওরাই জানে। তবে আজ আর আসবে না। কারণ ভয়ও তো আছে।

ওদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে ফেলে দেবে মেয়েটাকে নদীর ধারে। এসব তো ক্ষেত্রমণির জানা। এ বয়সে তো আর কম দেখলো না।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুড়ীর শীর্ণ পাঁজরা ঠেলে বেরিয়ে এলো।

সুশ্বেতা আকুল হয়ে বুড়ীকে জড়িয়ে ধরে বুকে রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমায় বাঁচাও তুমি। তা যদি না পারো তবে আমায় বিষ এনে দাও।

ক্ষেত্রমণি সুশ্বেতাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে—কি করে তোকে বাঁচাবো মা? দরজায় পাহারা রয়েছে। সদর দরজা ছাড়া যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। ওরা যদি জানতে পারে, তবে আমার জীবন আর থাকবে না।

সুশ্বেতা ক্ষেত্রমণির পায়ের ওপর মুখটা গুঁজে কাঁদতে থাকে। কোনো কথাই বলতে পারে না।

ক্ষেত্রমণি উঠে দাঁড়ালো। চোখে-মুখে চিন্তার রেখা।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এলো সে।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার ফিরে এলো।

সময় নিঃশব্দে কাটছে। মেয়েটাকে বাঁচাতে হলে আজই সন্ধ্যায় অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পারবে কি ক্ষেত্রমণি? বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে সুশ্বেতার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। সে-দৃষ্টিতে সুশ্বেতার বুক আশায় দ্রুত স্পন্দিত হয়ে উঠলো।

ক্রমে সন্ধ্যা নামলো।

ক্ষেত্রমণি একটা ঘন কালো রঙের চাদরে সুশ্বেতাকে ভালো করে ঢেকে বড় ঘোমটা টেনে দিয়ে বললে—চল্ মা আমার ঠিক পেছনে পেছনে। আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোনো ভয় নেই। তাড়াতাড়ি চল্।

ঘোমটায় ঢাকা সুশ্বেতা ক্ষেত্রমণির পেছনে পেছনে চললো।

দরজায় দাঁড়ানো বুধন সর্দার বললে—কে যায় ক্ষেত্রমণি তোর পাছু পাছু?

বুড়ী কৃত্রিম রাগতকণ্ঠে বললে—কে আবার? সেই মুখপুড়ী নাতনীটা। নতুন বিয়ে হয়েছে। নাতজামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আমার কাছে পালিয়ে এসেছে। নাতজামাইও সোজা মানুষ নয়। বৌ না পেয়ে থানায় গেছে। তাই চুপি চুপি ওকে কালো চাদরে ঢেকে ওর স্বামীর ঘরে পৌঁছাতে চলেছি। আমার পোড়া কপালের লিখন আর কি!

বুধন আর কিছু বললে না।

ক্ষেত্রমণি বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে নদীর ধার দিয়ে চলতে লাগলো দ্রুতপদে।

আরো খানিকটা চলার পরে কতকগুলো বাড়া দেখা গেল। ছোট ছোট ঘর। মাটির দেওয়াল। খড়ের চাল।

একটা কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা বাড়ীর সামনে এসে ক্ষেত্রমণি থামলো। আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়লো।

ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ এলো—কে গো ?

—আমি তোর বোন ক্ষেত্রমণি। তাড়াতাড়ি খোল্ না।

দরজা খুলে দিলে একটি আধা-বয়সী মহিলা। ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটিকে দেখে সুশ্বেতার বুকটা শান্ত হয়ে গেল।

মহিলাটি বললে—তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো।

ভেতরে এলো সবাই।

ক্ষেত্রমণি দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ করে বসে পড়লো। একটা পথ একটানা হেঁটে বুড়ী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওর বুকটা দ্রুত ওঠা-নামা করছে।

কিছুক্ষণ পরে ক্ষেত্রমণি ফিস ফিস করে বললে— ভাই কোথায় ?

—এই তো একটু আগে শুয়েছেন।

—তাকে একবার এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়, লক্ষ্মী।

—মেয়েটি কে, দিদি ?

—সবই বলবো। বলদেবকে আগে ডেকে নিয়ে আয়।

লক্ষ্মী তার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলো।

বলদেব চোখ মুছতে মুছতে এ-ঘরে এলো। বললে—কি খবর দিদি ? আজ হঠাৎ ছোট ভাইকে মনে পড়লো ?

ক্ষেত্রমণি সুশ্বেতার মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে বললে—ভাই বলদেব, বেশীক্ষণ বসতে পারবো না। ওরা যদি কোনোরকম খবর

পেয়ে থাকে তবে আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে।

লক্ষ্মী উৎসুক হয়ে বললে—কোথায় পেলে একে দিদি ?

—ও কাকা-কাকীমার সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছিল। কাল রাতে ওরা ষ্টেশন থেকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে আনিয়ে ওকে দেখাশোনা করবার জন্য রেখে গেছে। তবে আজ আর ওরা আসবে না। লোক জানাজানির ভয় আছে তো! কাল সকালে নিশ্চয়ই আসবে। মেয়েটার মুখে বোধহয় মোহ আছে, তাই সব ভুলে গেলাম আমি। পারলাম না এ সোনার প্রতিমাকে নষ্ট করতে দিতে ওই অসুরদের হাতে। ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি বলদেব।

—বেশ করেছো।—বলদেব বললে।

—ভাই, ওকে থানায় পৌঁছে দিয়ে আয়। তারপর ওরা যা করবার একটা সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে। দেরী করিসনে ভাই, তোরও বিপদ হতে পারে।

বলদেব দাঁতে দাঁত চেপে বললে—আমরা আজও মানুষ হতে পারিনি দিদি। মেয়েদের সম্মান আমরা রক্ষা করতে পারছি না—

ক্ষেত্রমণি বলদেবের দিকে তাকিয়ে বললে—চুপ কর্। তুই-আমি মুখ্যুমানুষ, আমরা কি এর প্রতিকার করতে পারি ?

বলতে বলতে কিছুক্ষণ থেমে তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—খেতে পাই না রে বলদেব। ছেলে-বৌয়েরা দূর দূর্ করে একদিন তাড়িয়ে দিলে রাস্তায় বসে কাঁদছিলাম, ওরাই ডেকে এনে এ কাজের ভার দিলে। তাছাড়া এ কাজ না করে উপায়ই বা কী! অন্য কাজ কি এখন করতে পারি ? ভাবলাম, আমি তো আর কিছু করছি না। তারপর এই মেয়েটাকে এনে ওরা খুব খুশী হয়ে বলেছিল, বিয়ে করবো। এমন সুন্দর মেয়ে, ঘরেই রাখবো।

সব শুনে বলদেব বললে—আচ্ছা, আমি যা-হয় একটা ব্যবস্থা করছি।

—এবারে এখান থেকে আমাকেও পালাতে হবে বলদেব। যাবার আগে ভগবানের নামে শপথ করে বলে যাবো, প্রভু, ক্ষমা করো—আমার শত অপরাধ মার্জনা করো। যতদিন বাঁচবো, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে খাবো।—বলতে বলতে ক্ষেত্রমণি অঝোরে কাঁদতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল।

রাত গভীর হয়ে আসে। বলদেব মস্তবড় পাকা বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মেটে দেওয়ালে টাঙানো সিঁদুর মাখানো কালীমায়ের পট। জবাফুলের মালায় সাজানো। বলদেব হাত জোড় করে প্রণাম করলো। তারপর বাইরে মুক্ত অঙ্গনে এসে দাঁড়ালো।

একটা সাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে সুশ্বেতা বলদেবের পিছু পিছু চলতে সুরু করলো।

আবার সেই পথ চলা। এ চলার শেষ কবে কে জানে।

থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-অফিসারের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললে বলদেব।

সুশ্বেতাকে ওরা পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার নারীকল্যাণ আশ্রমে। হারুকাকার খোঁজ মিললো না।

নারীকল্যাণ আশ্রম বেশ বড় প্রতিষ্ঠান। সুন্দর বাড়ী। কত দুঃখিনীর স্থান হয়েছে এখানে।

আশ্রমে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সকাল-সন্ধ্যায় আরতি হয়। মন্দিরের পবিত্র হাওয়ায় সুশ্বেতার দেহ-মন একেবারে জুড়িয়ে গেল।

*

* *

শ্বেতা ! শ্বেতা !!

আবার চিন্তায় ছেদ পড়লো। ফিরে এলো সে স্মৃতিরাজ্য থেকে।

—কই রে শ্বেতা, আয় দুজনে খেয়ে নিই।—মাসীমার ডাকে ধীরে ধীরে উঠে গেল সুশ্বেতা।

খাওয়া শেষ করে সুশ্বেতা ওর ঘরের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ স্বপ্নার কথাগুলো কানে আসতেই থমকে দাঁড়ালো। পা-দুটো থর্ থর্ করে কাঁপছে যেন।

স্বপ্না বলছে—কার কথা জিজ্ঞাসা করছো দাদা ?

—আজ রান্নাঘরে একটি মেয়েকে রান্না করতে দেখলাম। কে সে মেয়ে ? আর কোনোদিন তো দেখিনি।

—ও, তুমি জানো না বুঝি। মা যে একজন রাঁধুনী রেখেছেন !

রাঁধুনী !—আর কিছু শোনার আগেই সুশ্বেতা দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

কানের কাছে কে যেন বারবাব বলতে লাগলো—রাঁধুনী। রাঁধুনী ! রাধুনী !!

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। বাইরের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তাকিয়ে রইলো।

ঘুমন্ত শহর। কুয়াশার আস্তরণে ঢেকে গিয়েছে সারা শহরের বুক। যেন এক অদৃশ্য মহাশিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা একখানা ছবি।

সুশ্বেতা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিশীথিনীর সেই ঘুমন্ত রূপ।

পরদিন ভোরবেলা উনুন ধরিয়ে সুশ্বেতাকে ডেকে দেওয়া ঠিকে-ঝির নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ।

তারপর কাজ সুরু হয় প্রতিদিনের।

কলের জল পড়ার ছর্‌র্‌ ছর্‌র্‌ শব্দ, বাসনপত্রের ঝন্‌ঝনানি, বাটনা বাটার ঘসর্‌ ঘসর্‌ একটানা শব্দে বাড়ীটা মুখর হয়ে ওঠে।

সুশ্বেতা স্নান সেরে রান্নাঘরে চলে যায়। চায়ের সঙ্গে কিছু জলখাবার রোজই করা হয়। সারি সারি খাবারের ডিসগুলো নিপুণ হাতে সাজায় সুশ্বেতা। মন্দাকিনী নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করেন সবাইকে।

খেতে খেতে অনুপ বললে—আজকের ডালপুরীটা কিন্তু খুব ভালো স্বাদ হয়েছে। কে করেছে, নিশ্চয়ই মাসীমা। স্বপ্না তো নয়ই।

স্বপ্না ভ্রূ কুঁচকে বললে—আপনি কি করে বুঝতে পারলেন যে আমি করিনি।

চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল অনুপের চোখে-মুখে। কপট গাম্ভীর্যের রেখা মুখে টেনে এনে উত্তর দিলে—না, কখনো খাইনি কিনা তাই ও-কথা মনে হলো।

স্বপ্না চুপ করে গেল। সারাটা মুখ থমথমে অন্ধকার।

শ্যামল ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো। স্বপ্না বড় অভিমানী। পরিস্থিতিটা সহজ করবার অভিপ্রায়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো শ্যামল। বললে—মা, স্বপ্নাকে আর-দুখানা দাও।

স্বপ্না এবারে রেগে উঠলো। বললে—দাদা, তোমার লাগে তো তুমি নাও। আর যাদের ভালো লেগেছে, তাদের দাও।

মন্দাকিনী বললেন—সকলকেই নিতে হবে দুটো করে।

রমা ও অমিতা সমস্বরে বলে উঠলো—হ্যাঁ, মাসীমার কথা সবাইকে মানতে হবে। আর কোনো প্রতিবাদ করা চলবে না।

মন্দাকিনী উঠলেন। নিজে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন, সুশ্বেতা ডালপুরী ভেজে থালায় রেখে মুখটা দু-হাঁটুর মধ্যে গুঁজে বসে আছে।

ওকে এভাবে দেখে মন্দাকিনীর বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে উঠলো। তিনিও তো মা!

পায়ের শব্দে চমকে উঠলো সুশ্বেতা। বললে—আমায় কি আপনি ডেকেছিলেন মাসীমা?

ওর মুখখানার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন মন্দাকিনী। তারপর বললে—আমি তোকে ডাকিনি। আর তুই বা কেন এত ভয়ে ভয়ে থাকিস? নিজেকে কেন এত নীচুতে নামিয়ে রাখিস? আমার সঙ্গে ওঘরে চল্‌ তুই—

—আজ থাক্‌ মাসীমা।

—না, তোর কোনো কথাই শুনবো না আমি। তুই-ই নিয়ে আয় আরও কয়েকটা ডালপুরী।

অগত্যা মন্দাকিনীর সঙ্গে গিয়ে ডালপুরীগুলো রেখে আবার রান্নাঘরে ফিরে এলো।

সুশ্বেতার উপস্থিতিতে সবাই কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল।

অনুপের মুগ্ধ দৃষ্টি স্বপ্নার লক্ষ্য এড়ালো না। মনে মনে ভাবলে, পুরুষমানুষগুলো যেন কি! নতুন কিছু দেখলো তো লোভীর মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে! আর মা-ও তেমনি। ওকে এখানে নিয়ে আসার মানেই বা কী?

স্বপ্না মনে মনে মায়ের উপর খুব বিরক্ত হলো।

অনুপ প্রশ্ন করলে—এ মেয়েটি কে মাসীমা?

—মেয়েটির কথা বলতে গেলে এক মহাভারত হয় বাবা। তবে শুধু এটুকু বলছি, এত রূপ আর গুণ নিয়ে পৃথিবীতে এসেও সকলের চোখে ও নীচু হয়েই রইলো। ওর মত ভাগ্য আমি কখনও দেখিনি বা শুনিনি।

সকলেই চুপ করে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে রমা প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, ও কি বরাবর আপনার এখানেই থাকবে?

—চিরকাল কি কেউ কারো আশ্রিতা হয়ে থাকতে চায়, যদি তার নিজের কোনো আশ্রয় মেলে ?

স্বপ্না বললে—নিজের কাছে না রেখে কোনো আশ্রমে রেখে দিলেই তো সবচেয়ে ভালো হয়। লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

—একদিন আমি ওকে আশ্রমে যাবার কথা বলেছিলাম, তখন ওর কান্না দেখে শেষ পর্যন্ত ওকে আশ্রমে পাঠাতে পারিনি!

স্বপ্না বললে—আশ্রমে যাবে না তো কী করবে! শুধু সংসারের কাজ ? পাকিস্তানের অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া নিশ্চয়ই কিছু শেখেনি! ওকে এখানে তোমার রাখা কি সঙ্গত ?

—তোর কি মনের ধারণা, গাঁয়ে থাকলে লেখাপড়া কিছুই জানা যায় না। ও যখন ম্যাট্রিক পাস করে, তখন থেকেই এই দুর্ঘটনা।

স্বপ্না কোনো জবাব দিলে না। ঘরের সকলেই চুপচাপ।

নীরবতা ভঙ্গ করে একসময় মন্দাকিনীই বললেন—হ্যাঁরে অনুপ আর শ্যামল, তোদের দুজনকেই বলছি। তোদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এমন কেউ সহৃদয় ছেলে নেই, যে এই দুর্ভাগা মেয়েটাকে একটু পায়ে স্থান দেয় ? মেয়েটা তো দেখতে অমন সুন্দরী—

ঠোঁট উল্‌টিয়ে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে স্বপ্না বললে—সুন্দরী বলে এমন কিছু উর্বশী বা তিলোত্তমা নয়।

অনুপ বললে—দেখবো মাসীমা।

শ্যামল কোনো কথা বললে না। আবার নিস্তব্ধতা।

এবারে অমিতা বললে—অনুপদা! আপনার আর ক'দিন ছুটি আছে ?

—দিন সাত-আট।

এরকম পরিস্থিতিতে অন্য প্রসঙ্গ ওঠায় সকলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

রমা বললে—আমাদের সবারই খুব ইচ্ছে ছিল একদিন হুডরু ফল্‌সে পিকনিক করতে যাওয়ার। বিশেষ স্বপ্নাই—

শ্যামল বলে উঠলো—স্বপ্নার কথা অমান্য করবার মত স্পর্ধা আমাদের কারুরই নেই। ও যা বলবে, তাই হবে।

দাদার দিকে তাকিয়ে স্বপ্না হেসে উঠলো।

রমার দিকে চেয়ে শ্যামল প্রশ্ন করলো—স্বপ্না কি বলছিল রমা?

—বলছিল দাদা এলে আমরা সবাই মিলে হুডরু ফল্‌সে পিকনিক করতে যাবো।

—বেশ তো। সব ভার স্বপ্নার ওপরেই থাক।

—তোমরা যেদিন যাবে সেদিন আমিও যাবো।—স্বপ্না বললে।

—না, তা কেন? তুই যেদিন যাবি, সেদিন আমরাও যাবো।

—অনুপদাকে জিজ্ঞেস করো।

অনুপ বললে—শ্যামল যা বলবে তাই আমারও মত।

—তাহলে পরশুদিন খুব ভোরে আমরা রওনা হবো।

অমিতা বললে—খাওয়া-দাওয়ার কি বন্দোবস্ত হবে?

—কেন, ওখানেই রান্নাবান্না হবে।

রমা হতাশার ভঙ্গীতে বললে—তাহলেই হয়েছে! সব পণ্ড হবে। কে রান্না করবে শুনি?

—আমরা সবাই।—স্বপ্না বললে।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো অনুপ।

অনুপকে হাসতে দেখে স্বপ্না লাল হয়ে উঠলো। ঈষৎ রাগত-স্বরে বললে—হাসলে কেন?

—হাসির অর্থ নেই। এ বোকার হাসি।

মন্দাকিনী উঠে চলে গেলেন। শ্যামলও উঠলো। তার সঙ্গে সঙ্গে অমিতা ও রমা চলে গেল।

স্বপ্নাও উঠে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় ওর পেছনের বিনুনী ধরে কে যেন সজোরে টেনে ধরলো।

ফিরে দাঁড়ালো স্বপ্না। দু'চোখে আগুনের জ্বালা। অনুপ বললে—মেয়েমানুষের এত রাগ কেন ?

– মেয়ে বলে কি আর মানুষ নই। আর রাগই বা কখন দেখালাম !

—একটু গরমিল হলেই মেয়ে যেন রেগে খাণ্ডারী মেজাজিনী থেঁদি হয়ে যান।

—কি বলার আছে বলো না ? আঃ, বিনুনীটা ছেড়ে দাও।

—রেগে থাকলে কি আর কিছু বলা চলে ?

এবারে স্বপ্না হেসে ফেললো।

বিনুনীটা ছেড়ে দিয়ে অনুপ বললে—যাক, এবারে নিশ্চিন্ত !

স্বপ্না হাসতে হাসতে দৌড়ে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যার পর মন্দাকিনী শুয়ে রয়েছে। দু'পাশে শ্যামল আর স্বপ্না বসে আছে ! ঘরে ম্লান আলো।

শ্যামল বললে—স্বপ্না, তোর বন্ধুদের কেউ বাদ পড়েনি তো ?

—হুঁ, সবাইকে নেবো কিনা ! ওদিকে শুধু রাণু আর মিনতি, আর এদিকে রমা অমিতা।

—মা ! তুমি যাবে না ?—শ্যামল প্রশ্ন করলো।

—আমি আর তোদের মধ্যে গিয়ে কি করবো ?

স্বপ্না বললে—না মা, তোমাকে যেতেই হবে।

মন্দাকিনি বললেন—এখান থেকে সব গোছগাছ করে দেবো। তোদের কোনো অসুবিধাই হবে না।

ভাই-বোন দুজনেই মাকে জড়িয়ে ধরলো। বললে—তুমি না গেলে সব আনন্দই নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার কোনো ওজর-আপত্তিই শুনবো না আমরা।

মন্দাকিনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটু দ্বিধা-কুণ্ঠিত স্বরে বললেন—একটা কথা ছিল আমার—

স্বপ্না বললে—কী কথা মা ?

সহানুভূতির স্বরে মন্দাকিনী বললেন—আমরা সবাই যাবো, আর ওই মেয়েটা ঘরে পড়ে থাকবে ?

—একা কেন ? ঝি আছে। বাবাও আজ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। আর....একটা বেলা বই তো নয়।

—তা নয়। ওরও তো সখ-সাধ আছে।

—কিন্তু মা, আমরা যেখানে যাবো, সেখানেই কি বাড়ীর ঝি-চাকর-রাঁধুনী সবাইকে নিয়ে যেতে হবে ?

—না, তা নয়।

—তা যখন সম্ভব নয়, তখন কেন অসম্ভব কথ. বলছো।

—কিন্তু খুকী, ও যে বড় দুর্ভাগিনী। এতবড় পৃথিবীতে একা। আমরা মায়ের জাত। সন্তানের ব্যথা বুঝতে পারি। বুক ফেটে গেলেও সুশ্বেতা কারোর কাছে হাত পেতে কিছু চাইবে না, মুখ ফুটে কিছু বলবে না।

সকলেই নীরব হয়ে বসে রইলো। শ্যামল বললে স্বপ্না মা যখন এত করে বলছেন, তখন তাই হোক। আর মায়ের সাহায্যের জন্যেও তো একজন দরকার।

স্বপ্না কোনো জবাব দিলে না। ত্রস্তপদে উঠে চলে গেল।

স্বপ্না সুশ্বেতাকে মোটেও সহ্য করতে পারে না। বিনা অপরাধের বোঝা এসে সুশ্বেতার মাথায় পড়ে। কিন্তু কেন ?

ওর রূপ সবাইকে আকর্ষণ করে।

তবে কি স্বপ্না ওকে হিংসা করে ?

এক-এক সময় স্বপ্নার মনে হয়, বাবাকে সব কথা বলে ওকে চুপি চুপি কোনো অনাথ-আশ্রমে সরিয়ে দেয়। আবার কী ভেবে চুপ করে থাকে।

*

*   *

রাত গভীর। সুশ্বেতা নির্ঘুম চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আবার সেই চিন্তার রাজ্যে ফিরে এলো।

মনে পড়ে সেই নারীকল্যাণ আশ্রমের কথা। সুশ্বেতার কী ভালোই না লেগেছিল। নিজেকে মনে করেছিল সে যেন দেবদাসী, দেবতার চরণে উৎসর্গীতা ফুল। কিন্তু সেই রাতটা!

রাত তখন অনেকটাই হবে। রাতের স্তব্ধতার মাঝে সুশ্বেতা বিছানার মধ্যে গা এলিয়ে দিয়ে গীতা পড়ছিল একমনে। এমন সময় খবর এলো, আশ্রমের মালিক নতুন-মেয়ে সুশ্বেতার সঙ্গে আলাপ করবেন।

মণিকাদির সঙ্গে দোতলার শেষ প্রান্তের ঘরটিতে গিয়ে দেখলো, একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বসে আছেন। সুশ্বেতা গিয়ে প্রণাম করে মুখ তুলেই চমকে উঠলো।

ভদ্রলোক সুশ্বেতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে-দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও গভীর যে, সে যেন এক লহমায় সুশ্বেতার সমস্ত শরীর লেহন করে নিলে।

বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হয়ে উঠলো সুশ্বেতার। সমস্ত শরীর শির্ শির্ করে উঠলো। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগলো কপালে।

প্রৌঢ় হাসিমুখে বললেন—কাছে এসো।

মণিকাদির ইঙ্গিতে সুশ্বেতাকে কাছে যেতেই হলো।

প্রৌঢ় তখন দু'হাত বাড়িয়ে সুশ্বেতাকে ধরতে যেতেই সুশ্বেতা সভয়ে পিছিয়ে গেল।

এবার প্রৌঢ় উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। বললেন—আজ থাক। সবে নতুন এসেছে। আর-একদিন আলাপ-পরিচয় হবে।

সুশ্বেতা ফিরে এলো নিজের ঘরে। লোকটার রোমশ হাতের স্পর্শে যেন ওর শরীর বারবার শিউরে উঠতে লাগলো। বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো সে।

এভাবে কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন মণিকা এসে বললে—চলো, তোমার কয়েকখানা শাড়ি কিনে নিয়ে আসি।

—আমার তো রয়েছে দুখানা। আর বেশী কী হবে মণিকাদি?

—দুটো শাড়ীতে কি চলে? এখানে যা নিয়ম তা মেনে চলতেই হবে। আটখানা শাড়ী আশ্রম থেকে কর্তাবাবু প্রত্যেক মেয়েকেই দেন।

সুশ্বেতা আর কোনো উত্তর দিলে না। রাশভারী মণিকাদিকেও কেমন যেন ভয় ভয় করে।

মণিকাদি এবারে বললে—তুমি যদি আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করে চলো, তাহলে এখানে থাকা তোমার চলবে না।

সুশ্বেতা নীরবে মণিকাদির অনুসরণ করলো।

একটা বড় কাপড়ের দোকান থেকে শাড়ী কিনে ওরা বেরিয়ে এলো। দোকানের সামনেই পথের মোড়ে একটা সুদৃশ্য কালো রঙের গাড়ী দাঁড়িয়ে। মণিকা সুশ্বেতাকে নিয়ে তাতে উঠে বসলো।

গাড়ী তীব্র গতিতে ছুটে চললো। গাড়ীর ভেতরটা অন্ধকার। ওপাশে কে যেন বসে আছে! পথের আবছা আলোয় সুশ্বেতা যাকে দেখতে পেলে, তাতে সারা শরীরে ঠাণ্ডা বরফ গলা জলের স্রোত বয়ে গেল।

একী! এখানে উনি কেন? আশ্রমের মালিক স্বয়ং বসে রয়েছেন। সুশ্বেতার সমস্ত অনুভূতি যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে!

ভবতোষ লাহিড়ী যেন শিকারী বেড়ালের মত তীক্ষ্ণ চোখে সুশ্বেতার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি আরো একটু কাছে সরে এলেন। পাখীর বুকের মত সুশ্বেতার নরম হাত দুখানা চেপে ধরলেন তিনি।

চমকে উঠলো সুশ্বেতা। কী জঘন্য দৃশ্য !

মুহূর্তে শাড়ীর বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে মারলো ভবতোষ লাহিড়ীর চোখে-মুখে। 'উঃ !' বলে তিনি প্রচণ্ড শক্তিতে সুশ্বেতাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সুশ্বেতা দিশেহারা হয়ে ভবতোষ লাহিড়ীর নাকটা সজোরে কামড়ে ধরলো।

তারপর সুশ্বেতার আর কিছুই মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরলো তখন মনে হলো, ওর সারা শরীরে যেন অবসাদ জড়িয়ে রয়েছে। পাশ ফেরবার মত শক্তিও নেই। কাছেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। তাঁর চোখে-মুখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন।

ওকে চোখ মেলতে দেখেই ভদ্রলোক মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—এখন কেমন লাগছে মা ?

—ভালো। কিন্তু আমি কোথায় ?

—হাসপাতালে।

—হাসপাতালে ?

—হ্যাঁ, তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে !

একটু একটু করে মনে পড়ছে সব ঘটনা সুশ্বেতার।

ওর ভীতি-কাতর চাউনী দেখে নবীনমাধববাবু বললেন—আর কোনো ভয় নেই মা। ওই শয়তানটাকে তুমি বেশ উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছো। শূর্পনখার মত কাটা-নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। পুলিশ হাজতে পুরে রেখেছে। এইসব ভদ্রবেশী দুশ্চরিত্র লোক পরোপকারের মুখোস পরে টাকা দিয়ে আশ্রম খুলে নিজের পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। এভাবে কত নিষ্পাপ মেয়ের যে সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন, কে খোঁজ-খবর রাখে। তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি মা! সতী-সাবিত্রীর দেশে জন্ম যখন, তখন তোমার গায়েও তো সেই একই রক্ত বইছে।

সুশ্বেতা কোনো জবাব দিলে না।

নবীনমাধব বললেন—একটু সুস্থ বোধ করলে চলো তোমায় বাড়ীতে রেখে আসি। তোমার মা-বাবা নিশ্চয়ই এতক্ষণ থানায় খবর দিয়েছেন। ঠিকনাটা বলো। আর কখনো একা এভাবে রাস্তায় চলাফেরা করো না।

সুশ্বেতার মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওর ঠোঁটটা কাঁপছে। অনেক চেষ্টায় কান্নাটা যেন ঠেকিয়ে রেখেছে সে!

ওর বেদনার্ত করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন—তোমার বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন। আর আমিও এখানে থাকি না। কাল সকালেই চলে যেতে হবে আমাকে।

এবারে সুশ্বেতা উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো।

নবীনমাধব বললেন—যদি তোমার কিছু বলার থাকে বলো মা, আমি শুনবো।

সুশ্বেতা ধীরে ধীরে নিজের বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী বলে গেল।

তিনি সব কথাই মন দিয়ে শুনলেন। শুষ্ক চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টল্ টল্ করতে লাগলো। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—মা! তোমাকে আশ্রয় দিলে আমি বড়ই সুখী হতাম। সংসারে আমার কোনো বন্ধনই নেই। স্ত্রী ও কন্যা এক রাত্রের মধ্যেই কলেরাতে মারা গেল। আমি সারা ভারতে তীর্থের পর তীর্থ করে ঘুরে বেড়াই। তীর্থের দেবতা আমায় সব সময় হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। তাই এক জায়গায় স্থির থাকতে পারি না!

সুশ্বেতা চুপ করে রইলো!

তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

নবীনমাধব সুশ্বেতাকে রাঁচিতে নিয়ে এলেন এবং তাঁরই সহকর্মী নির্মলবাবুর কাছে রেখে তিনি চলে যান্।

সুশ্বেতা আর ভাবতে পারে না।

*

* *

পরদিন শেষ রাত থেকেই যাত্রার আয়োজন সুরু হলো। খুব ভোরেই রওনা হবে। সবাই এসে উপস্থিত। দুটো গাড়ী ঠিক করা হয়েছে। শ্যামল, অনুপ, রাণু, স্বপ্না, অমিতা ও রমা এক গাড়ীতে এবং অন্যটায় মন্দাকিনী, সুশ্বেতা ও বাড়ীর ঝি-চাকর আর একরাশ জিনিসপত্র।

গাড়ী ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। দূরে নীল পাহাড়ের সারি। কুয়াশা-ভেজা আকাশের বুকে লুকিয়ে পড়েছে নিষ্প্রভ তারার দল। খাদ-ঘেঁষা পাহাড়ী রাস্তা।

চমৎকার দৃশ্য! সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

অমিতাদের গাড়ীটা গিয়ে দাঁড়ালো।

পরের গাড়ীটাও এসে একই জায়গায় থামলো। জিনিসপত্র নামানো হলো। গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে স্বপ্না নামলো।

মন্দাকিনী চারদিকে তাকিয়ে বললেন—বেশী এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করো না তোমরা।

রাণু খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। বললে—মাসীমা, বড় ভীতু আপনি।

—হ্যাঁ মা, বেশী দূরে না যাওয়াই ভালো।

স্বপ্না বললে—একটু তো যেতেই হবে মা!

মন্দাকিনী বললেন—আমি তাহলে রান্নার জোগাড় দেখি। ওরে ভজুয়া, জিনিসপত্রগুলো একবার গুণে দেখ্ দেখি বাবা!

শ্যামল হেসে জবাব দিলে—সবই ঠিক আছে মা।

ওরা সকলে ইতিমধ্যে একটা সুন্দর জায়গা খুঁজে বের করেছে। জায়গাটা বেশ ফাঁকা।

মন্দাকিনীর খুব পছন্দ হলো। তিনি ভজুয়া আর মানদাকে জায়গা পরিষ্কার করে রান্নার বন্দোবস্ত করতে বললেন।

সুশ্বেতা চুপ করে মন্দাকিনীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—শ্বেতা, সকালের জলখাবারগুলো প্লেটে সাজিয়ে দে, আমি দিয়ে দেবো সবাইকে।

সুশ্বেতা নীরবে মন্দাকিনীর আদেশ পালন করতে লাগলো।

সকালের প্রথম রোদলাগা কচি ঘাসের ওপর সকলে বসে পড়লো। মন্দাকিনী হাতে হাতে প্লেটগুলো তুলে দিলেন। শ্যামল নীরবে লক্ষ্য করলো সুশ্বেতার লজ্জায় নুয়েপড়া মুখখানার দিকে।

চা-জলখাবার খাওয়ার পর ওরা সবাই রওনা হলো। শ্যামলের খুব ইচ্ছা না থাকলেও ওদের সঙ্গে যেতেই হলো তাকে!

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললো ক্ষুদ্র দলটি।

পথের বাঁকে বাঁকে কত ছবি তোলা হলো।

স্বপ্না, অমিতা, রমা ও রাণু হাসিতে গানে আর গল্পে সারাটা পথ মুখর করে তুললো।

কিছুক্ষণ চলার পর শ্যামল এক জায়গায় থেমে গেল, বললে—তোরা সবাই ঘুরে আয়। আমি এখানে একটু বসবো।

ওরা চলে গেল।

চমৎকার জায়গাটা। সুন্দর ঝকঝকে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ চলে গেছে। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছে কচি পাতার ঝালর ঝুলছে। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ঝল্‌মল্‌ করছে।

খট্‌....খট্‌....খট্‌....

শব্দ শুনে শ্যামল ফিরে তাকালো। দেখতে পেলে দুটো হরিণ দৌড়ে চলে গেল নীচে। বোধহয় জল খেতে। কী সুন্দর দেখতে হরিণ দুটো। সেদিকে চোখ ফেরাতেই হঠাৎ চকিতে একটি সুন্দর মুখ শ্যামল দেখতে পেলে।

ছোট-বড় পাথরের মধ্যে দিয়ে সুবর্ণরেখার রূপালী জল এসে

যেখানে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ঠিক প্রায় তারই কাছাকাছি একটি মেয়ে চুপ করে বসে আছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখছে দূর পাহাড় আর বনগুলোর দিকে।

ও কে! সুশ্বেতা না?

মাধবী-মঞ্জরীর মত সুশ্বেতা যেন স্বপ্নমালঞ্চে ফুটে উঠেছে। তার দুটি চোখে লাজুক দৃষ্টি।

আজই যেন ভালো করে শ্যামল সুশ্বেতাকে দেখলো। এতদিন দেখলেও এমন করে কোনোদিন দেখেনি সে।

শ্যামলের মনটা বেদনায় ভরে ওঠে। ধীর পদক্ষেপে একটু এগিয়ে গিয়ে বললে—শুনুন!

চমকে ফিরে তাকালো সুশ্বেতা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

শ্যামল বললে—আমায় চিনতে পেরেছেন?

মাথাটা একপাশে এলিয়ে সুশ্বেতা ঘামতে লাগলো। বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগলো।

এখন যদি স্বপ্নারা এসে উপস্থিত হয়! তবে?

শ্যামলের উদাস মনে কেমন একটা বেদনার ছোঁয়া লাগলো বললে—আপনি এত ভয়ে ভয়ে থাকেন কেন বলুন তো? মা তো আপনাকে—

কথার মাঝখানেই সুশ্বেতা বলে উঠলো—আমি যাই....

বলে দ্রুতপায়ে চলে গেল সে।

শ্যামল স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। স্বপ্নারাও সবাই এসে এখানে মিলিত হলো। শ্রান্তি আর ক্লান্তির বিলাসিতায় সকলে যেন অবগাহন করে উঠেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর সকলে বসে গেল খেতে। মাংস, পোলাও, চাটনী, দে আর মিষ্টি।

সকালে খাওয়ার আনন্দে সকলেই ছিল মুখর। সন্ধ্যায় আবার তারাই হয়ে গেছে নীরব ও নিশ্চুপ। বাড়ী ফিরে এলো সবাই।

কয়েকটি দিন কেটে গেল।

রমা ও অমিতা চলে গেছে।

অমিতাকে সবাই ভালোবাসেন। বড়লোকের বিদুষী কন্যা। ভবিষ্যতে এ বাড়ীর বধূ হয়ে আসবে সে।

ওরা চলে যেতেই বাড়ীটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। সত্যি বলতে কি, রমা একাই বাড়ীটাকে মাতিয়ে রেখেছিল। স্বপ্নাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। অনুপ ফিরে গেছে কর্মস্থলে। শুধু রাণু আসে মাঝে মাঝে। কিন্তু সুশ্বেতার জীবনের কোনো বৈচিত্র্য নেই। একই ছন্দে একই সুরে বাজে তার জীবনতন্ত্রীগুলো।

সেদিন দোতলার ছাদে একা একা দাঁড়িয়েছিল সুশ্বেতা। একটু খস্ খস্ আওয়াজ কানে আসতেই পেছন ফিরে দেখলো, শ্যামল এসে দাঁড়িয়েছে।

সুশ্বেতার মুখটা শুকিয়ে গেল। শরীরটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো।

শ্যামল সহজ সুরে বললে—ভয় পেয়েছেন ? আমি শ্যামল।

ভীরু কপোতীর মত তাকালো সুশ্বেতা।

শ্যামল একটু হেসে বললে—মাপ করবেন। আমি যখন-তখন এসে পড়ি।

—না না, আমি নীচে যাই…

—নীচে ? কেন ?

চমকে উঠলো সুশ্বেতা। শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো শ্যামলের দিকে।

শ্যামল আবার বললে—লেখাপড়া জানেন অথচ এমনভাবে না থেকে তো অনায়াসেই আরো লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারেন।

নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলে সুশ্বেতা—হয়তো পারি। কিন্তু….

—কিন্তু কি ? আমি আপনার পড়াশোনার বন্দোবস্ত করবো।

—না, তা হয় না।

—কেন ?

—আপনারা দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, সেটুকুই কি আমার পক্ষে যথেস্ট নয় ? তার ওপর আবার পড়ার খরচ—সেটা অত্যাচার। বরঞ্চ আমাকে যদি একটা ছোট-খাটো কাজ জোগাড় করে দিতে পারেন, আমি তাতেই খুসী হবো।

—আচ্ছা, তাই দেখবো।

সুশ্বেতা আর কোনো কথা বললো না। ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

সেদিন দুপুরবেলা। সারা বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম। চারদিকে ঝলসানো রোদ।

সুশ্বেতা নিজের ঘরে বসে উল দিয়ে মন্দাকিনীর জন্য একটা ফুলহাতা ব্লাউজ বুনছে।

রোদভরা পৃথিবী মুক্তোর মত টল্‌টল্‌ করছে। বোনাটা বন্ধ রেখে সুশ্বেতার চোখ ডুবে যায় সুনীল আকাশের গায়ে! হাত-পা ছড়িয়ে বসে সে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

—বসে বসে একা একা কি ভাবছেন ?—এঘর থেকে ওঘরে চলার ফাঁকে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে শ্যামল প্রশ্ন করলো।

সহসা কোনো জবাবই দিতে পারে না সুশ্বেতা। জলভরা-চোখদুটি তুলে বললে—কই, কিছুই তো ভাবছি না।

—আমায় তো বসতে বললেন না ?

—ও হ্যাঁ, বসুন। কিন্তু এখানে····

—কেন, এখানে কি বসতে পারি না ?

সুশ্বেতা কোনো জবাব দিলে না, শুধু দু'চোখ ভরে জল এলো। শ্যামল বললে—কথার কোনো উত্তর দিলেন না যে ?

এবারে মুখ তুললো সুশ্বেতা। শ্যামল বিস্মিত হয়ে ব্যথিত স্বরে বললে—একী, আপনি কাঁদছেন ?

কাঙাল অন্তরের স্বপ্নটা বুঝি দুলে ওঠে। সেও ক্ষণিকের মত ভেসে যায় শ্যামলের ওই কথাগুলোর মধ্যে। একটা গভীর আবেশে ভরে ওঠে সুন্দর মুখখানা। সুশ্বেতা রুদ্ধকণ্ঠে বললে—আমি আপনাদের আশ্রিতা। আমার এখানে আপনাকে কেউ দেখতে পেলে রাগ করবেন।

—রাগ করবেন ? কে ?

—সকলেই।

—সেদিন কাজের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেকথা মাকে বললে মনে হয় ভালো হয়।

—বলবো।

—আগে মায়ের মত হোক্। তারপর আমি চেষ্টা করবো।

—মাসীমা এতে অমত করবেন না।

—মা যেন সেদিন কি বলছিলেন বাবাকে।

—কি ?

—সে অন্য কথা।

অন্য কথা! সুশ্বেতা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। কী এমন কথা মাসীমা বলছিলেন! তবে কি····

ওর দিকে তাকিয়ে শ্যামল হেসে বললে—ভয় পাবার মত কোনো কথাই নয়। আপনার বিয়ের কথা।

—বিয়ে! আমার!—ভূতে পাওয়া রোগীর মত উচ্চারণ করলো সুশ্বেতা।

—কেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? বিয়ে তো সব মেয়েরই হয়।

—সব মেয়ের সঙ্গে কি আমার তুলনা করা চলে ?

—কেন ?

—আপনি আমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ঠাট্টা করছেন ?—অপূর্ব দৃঢ়তা সুশ্বেতার কণ্ঠে ফুটে উঠলো।

শ্যামলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো। শুধু বললে—ওসব কথা আজ থাক। আমি যাই।

শ্যামল চলে গেল।

এর কিছুদিন পরে শ্যামেলের পরীক্ষার ফল বেরুলো শ্যামল কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছে। প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পদার্থ বিজ্ঞানে।

সারা বাড়ীতে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। স্বপ্না একাই যেন একশো হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—বিরাট ভোজ দিতে হবে কিন্তু। তাতে পরিচিতদের মধ্যে কেউ বাদ যাবে না।

একমাত্র ছেলের কৃতিত্বে মন্দাকিনীর অন্তর গর্বে ভরে উঠেছে।

স্বপ্নাই বন্দোবস্ত করলো। অনুপকে চিঠি লিখলো আসার জন্য। এদিকে অমিতা রমাও বাদ গেল না। একবেলার জন্য হলেও আসতে হবে সবাইকে। আনন্দোৎসবের আনন্দ শিহরণ স্বপ্না ছড়ালো বাড়ীর সকলের চেতনায়।

ক্রমে এগিয়ে আসছে সকলের বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি।

উৎসবের আগের দিন অমিতা, রমা ও অনুপ এলো।

সন্ধ্যার পর খাওয়া।

সুশ্বেতা আজ আর তার ঘর থেকে বেরোয়নি।

নানা লোকের নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে মাসীমা হয়তো বিব্রত হয়ে পড়বেন, সেজন্য নিজেই নিজেকে সবার আড়ালে লুকিয়ে রাখলো সুশ্বেতা।

সেই ঘৃণিত কাহিনী শুনে কেউ বা হাসবেন, কেউ বা অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাবেন, আবার কেউ বা দু'চারটে মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করে রূপের প্রশংসা করবেন। কোনোটাই সুশ্বেতার ভালো লাগে না। মন্দাকিনীকে বলেছে, আমার শরীরটা আজ ভালো নয়, আমি শুয়ে থাকবো, আমায় ডাকবেন না।

মন্দাকিনী কী বুঝলেন কে জানে। তিনি ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

সুশ্বেতার অন্তর বেদনায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো সে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

বাড়ীর সামনেটা আলোয় ভরে গেছে। লনে অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। হৈ-হল্লা, জুতোর মচ মচ শব্দ, গানের সুর, উচ্ছ্বসিত হাসি ভেসে আসছে। যেন খুশীর বান ডেকেছে সারা বাড়ীতে।

সেখানে আজ সুশ্বেতার স্থান কোথায়?

পুত্র-গর্বে মাসীমার আজ এক গরবিনী মূর্তি।

আজ সকালেই তিনি সুশ্বেতাকে বললেন—আজ তোকে একখানা ভালো শাড়ী পরতেই হবে শ্বেতা। সবাই সেজেগুজে হেসে-খেলে বেড়াবে, আর তুই কিনা আমার চোখের সামনে যোগিনী সেজে থাকবি? তোর সব হারালেও আমি আছি। আজ আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন। তোর কোনো কথাই শুনবো না।

সুশ্বেতা কিছু বলার আগেই তিনি নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন সোনার মটর মালা, ঝুম্‌কো আর বালা। বাক্স খুলে একখানা জরিপাড় নীলাম্বরী শাড়ী বের করে ওকে ভালো করে পরতে বললেন

সুশ্বেতা আর কোনো কথাই বলতে পারলো না। ওর দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনী সহসা সুশ্বেতাকে বুকে চেপে ধরলেন।

স্নেহের স্পর্শে সুশ্বেতার অন্তর ভরে উঠলো আনন্দে। ওর আজ মনে হতে লাগলো, সে আজ পূর্ণা। জীবনের বেচাকেনার হাটে দেউলিয়া নয়। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দীপ্ত তারা-গুলো চোখে পড়লো সুশ্বেতার। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাতীরের একখানি গ্রামের ছবি ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে।

সহসা কার পায়ের শব্দে ওর চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, ঘরের স্তিমিত আলোয় শ্যামল দাঁড়িয়ে।

এ কে! শ্যামল! কিন্তু এখানে কেন? সুশ্বেতা ভয়ে আতঙ্কে ঘেমে উঠলো। একটা কথাও বলতে পারলে না।

শ্যামল আরও একটু এগিয়ে এলো, ডাকলে—শ্বেতা!

সে-ডাকে সুশ্বেতা শিউরে উঠলো। কেমন বিহ্বলতায় সব যেন অসাড় হয়ে আসছে। মিনতি-ভরা কণ্ঠে সুশ্বেতা বললে—আপনি এখানে কেন? আপনাকে নিয়েই তো উৎসব। আপনার সেখানে থাকাই উচিত। আপনি যান।

—যদি আমি এখান থেকে না যাই, কী করবে তুমি!

—কী করবো? কিছুই না। কিন্তু তাতে আপনার কী লাভ হবে জানি না, তবে আমার অনেক ক্ষতি হবে।

—কি ক্ষতি?

—হয়তো বা এখানকার আশ্রয় হারাবো। আবার ভেসে যাবো অন্য কোথাও।

শ্যামল হাসলো। বললে—সে-ভয় নেই। আর এদিকটায় কেউ নেই। সবাই খেতে বসেছেন। আমি এসেছিলাম একটা কথা তোমার নিজের মুখ থেকে শুনবো বলে।

—কী কথা?

—আজকের দিনেও কি তুমি আমার সঙ্গে সহজ হবে না?

উদ্গত কান্নাটাকে চেপে সুশ্বেতা অতিকষ্টে বললেন—আপনি কি আমার জীবনের কাহিনী শোনেন নি?

—ওসব থাক শ্বেতা।

—তবে কেন আমাকে বারবার অমন করে নাম ধরে ডেকে প্রলোভন দেখাচ্ছো?

—প্রলোভন! এ কী বলছো তুমি?—বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো শ্যামল।

এবার সুশ্বেতা নিজেকে হারিয়ে ফেললো। অবিরত মানসিক দ্বন্দ্বে অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। আঙুলের ফাঁক দিয়ে তপ্ত অশ্রুধারা ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো।

একী হলো! যাঁরা দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদেরই সর্বনাশ করবে সুশ্বেতা?

সমাজে সুশ্বেতার স্থান নেই। একথা জেনেশুনেই কি শ্যামল তাকে নিয়ে খেলা করছে।

মন্দাকিনীর একমাত্র ছেলে। আর অমিতার সঙ্গে শ্যামলের বিয়ে একরকম ঠিক হয়ে আছে, একথা সুশ্বেতা বহুদিন শুনেছে!

শ্যামল আরো কাছে এগিয়ে এলো। সুশ্বেতার হাতখানা তুলে নিলে নিজের হাতে। কোমলকণ্ঠে বললে—আমায় ক্ষমা করো শ্বেতা। ব্যথা পাবে—এ আমি ভাবিনি।

শ্যামল চলে গেল।

শ্যামলের স্পর্শে সুশ্বেতার সারা শরীরে শিহরণ জাগলো। সে শুধু আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

কিছুক্ষণ কান্নার পর মনটা একটু শান্ত হলো সুশ্বেতার। উঠে দাঁড়ালো সে।

কিন্তু একী? ওর গলায় এ বেলফুলের মালা কে দিলে? এ মালা তো শ্যামলের গলায় দেখেছিল সুশ্বেতা! তবে কি শ্যামলই পরিয়ে দিয়েছে ওকে?

থর্ থর্ করে সুশ্বেতার সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। আবার মাটিতে বসে পড়লো। একী হলো! এই কি সুশ্বেতার ভাগ্য?

কিন্তু একি অভিশাপ বহন করে আনলো ওর জীবনে? পায়ের তলার মাটিটুকুও বুঝি আজ ধ্বসে পড়লো। কিন্তু কী করবে সুশ্বেতা। কোথায় যাবে? মালাখানা হাতে করে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো সুশ্বেতা।

দোতলায় কলরব শোনা যাচ্ছে, আর একতলায় একটি ভাগ্যহতা তরুণী দুর্লভ জিনিস পেয়েও আকুল হয়ে কাঁদছে।

একে একে সবাই বিদায় নিলে। মুখর বাড়ী নীরব হয়ে এলো।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত শ্যামলের চোখে ঘুম এলো না। নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। সারা মনে জুড়ে বিরাজ করছে একমাত্র সুশ্বেতা।

অন্তরালবর্তিনীর নীরব আকর্ষণ শ্যামলকে দুর্বার বেগে টানছে। শ্যামলের সাধ্য কি তা প্রতিরোধ করে!

সুশ্বেতার কালো চোখের শান্ত সুন্দর দৃষ্টি ওর অন্তরে প্রদীপশিখা হয়ে জ্বলছে।

শ্যামল আর কিছুই চায় না। শুধু চায় সুশ্বেতাকে পরিপূর্ণরূপে পেতে। আর····অন্ধকার নিরালা রাতে নীল আকাশের নীচে সুশ্বেতার মত অচঞ্চলা নারীর পাশে থাকতে। রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে ওরা ওদের জীবনের সুর মিলিয়ে নেবে!

হ্যাঁ, শ্যামলকে তবু অপেক্ষা করতে হবে বৈকি!

কিন্তু বাবা আর স্বপ্নার নিশ্চয়ই অমত হবে। কারণ, সকলেরই ইচ্ছা অমিতাকে বধূরূপে ঘরে আনা।

অমিতা আর সুশ্বেতা। এর একটা নিষ্পত্তি চাই।

শ্যামলকে হয়তো শীঘ্রই কোথাও কাজ নিয়ে চলে যেতে হবে। দূরে গেলেও ওর সারা দেহে মনে হৃদয়ে সুশ্বেতা হয়ে থাকবে পূর্ণ বিকশিতা। যা শারদশ্রীর মত জ্বল্ জ্বল্ করবে।

ভাবতে ভাবতে দু'চোখ জুড়ে শ্যামলের তন্দ্রা এলো।

কিছুদিন পরে।

অমিতা, রমা ও অনুপ চলে গেছে। বাড়ীটায় আবার নিস্তব্ধতার ঢল নেমেছে।

সেদিন দোতলার বারান্দার শেষ প্রান্তের কয়েক ধাপ সিঁড়ি

ভেঙে শ্যামল বারান্দায় এসে বসলো। মুখে স্মিত হাসি। স্বপ্না দাদার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে—মা, দাদাকে ঠিক একজন বড় অফিসারের মতই লাগছে।

মন্দাকিনী উত্তর দেবার আগেই শ্যামল উঠে এসে মায়ের পাশে বসতেই স্বপ্না উঠে দাঁড়ালো।

শ্যামল বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—একী রে, উঠে দাঁড়ালি যে। কোথাও যাবি নাকি?

মিষ্টি হেসে নতমুখে স্বপ্না বললে—তোমার জন্যে আমি নিজে খাবার তৈরী করেছি দাদা! গরম গরম ভেজে নিয়ে আসছি।

শ্যামল খুশী হয়ে বললে—তুই এত ধৈর্য ধরে খাবার করেছিস, এ সে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না রে।

—বিশ্বাস না হয় মাকেই জিজ্ঞেস করো না!

মন্দাকিনী হেসে বললেন—হ্যাঁরে, সত্যি! আজ সকাল থেকেই ও রান্নাঘরে বসে সিঙ্গাড়া ভেজেছে।

শ্যামল বললে—তাহলে আর দেরী করে লাভ কি! শুভকাজ তাড়াতাড়িই শেষ হোক। অপরপক্ষ তো প্রস্তুত হয়েই আছে।

স্বপ্নার চোখে-মুখে কে যেন একরাশ আবীর ছিটিয়ে দিলে। বললে—আমার কথা আর বলো কেন? তোমার নিজের যদি কিছু বলার থাকে তাই বলো। ওদিকেও তো অপরপক্ষ বরণ-মালা হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে।

শ্যামল কোনো জবাব দিলে না।

স্বপ্না ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপ্না ফিরে এলো। পেছনে ভজুয়া ট্রে-তে করে চা ও গরম সিঙ্গাড়া নিয়ে ঘরে এলো। স্বপ্না খাবারের প্লেটটা ও চা শ্যামলের সামনে এগিয়ে দিলে।

মন্দাকিনী বললেন—একটা কথা তোকে বলবো-বলবো মনে করেছি শ্যামল। এখন বলবো কি?

শ্যামল চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে—হ্যাঁ, বলো।

মন্দাকিনী বললেন, এবার তো পড়াশোনা শেষ হলো—

বিস্ময়ে শ্যামল বললে—শেষ হলো কোথায় ?

—তা না হলেও আপাততঃ নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে ?

—হ্যাঁ, আপাততঃ হয়েছে বটে।

—আমি বলছিলাম কি—

থেমে গেলেন মন্দাকিনী কথার মাঝখানেই। তারপর বললেন—উনি বললেন সেদিন, স্বপ্নার তো এবার বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। ওর বিয়েটা এখনই দেবেন। অনুপের মা-বাবারও তাই মত।

শ্যামল একবার স্বপ্নার মুখের দিকে তাকালো। চোখে চোখ পড়তেই স্বপ্না দৌড়ে চলে গেল।

শ্যামল স্বপ্নার গতিপথের দিকে চেয়ে বললে—বেশ তো, অনুপের মত ছেলে সহজে মেলে না !

—আমাদের ইচ্ছা অমিতাদেরও পাকা কথা দিই। তোর কোনো অমত হবে না জেনেও আবার তোকে জিজ্ঞেস করছি।

—আমার মনের কথা কী করে জানলে তুমি ?

—মায়ের কাছে কি সন্তানের কিছু গোপন থাকে ?

শ্যামল চুপ করে রইলো।

এ প্রসঙ্গ আজ তো আর নতুন করে অবতারণা হয়নি। কিছুদিন যাবৎ অমিতার সঙ্গে শ্যামলের বিয়ের কথা উভয় পরিবারেই আলোচিত হচ্ছে।

—কী রে, চুপ করে রইলি যে !

—কী আর বলবো ?

—তাহলে ওদের বাড়ীতে পাকা কথা দিয়ে চিঠি দিই ?

মা কি তার কাছে প্রতিশ্রুতি চায়।

একটা করুণ বেদনার ছায়া-মাখানো সুন্দর মুখ শ্যামলের মনের পটে ফুটে উঠলো ! কোনো উত্তর দিতে পারে না সে।

মন্দাকিনী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

দুজনেই নীরব।

এক সময় শ্যামল ডাকলো—মা!

—কেন?

—একটা কথা বল্‌বো?

—বল্‌।

— না, থাক। বললে তোমরা মনে দুঃখ পাবে।

মন্দাকিনী কঠিন হয়ে উঠলেন এবার। বললেন--দুঃখ যদি আমার পাওনা থাকে তবে সে আমাকে পেতেই হবে।

—কিন্তু!....অসমাপ্ত কথা আর শ্যামল শেষ করতে পারে না।

মন্দাকিনী আবার বললেন...অমিতা কি তোর যোগ্যা নয়?

—না না, এসব কথা কেন তোমার মনে হচ্ছে মা? আমার এখন মোটেই বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই। তাঁরা কেন মিছিমিছি আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকবেন। আর আমার মত ছেলেরও অভাব নেই বাংলাদেশে।

—অভাব নেই একথা তোকে কে বললে শ্যামল?

—আমি জানি।

—কিন্তু আমাদের সাধ...আমার সংসারে যে বধূ হয়ে এসে ফুল ফোটাবে আমার আঙিনায়। আমি জানি, অমিতা তা পারবে।

—মা, এবার আমায় ক্ষমা করো!

—সে কি রে, বিয়ে করে কেউ কোনোদিন পড়াশোনা করেনি?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন চিন্তা করে শ্যামল বললে—মা, আমার দিকে চেয়ে এখন বিয়েটা স্থগিত রাখো।

মন্দাকিনী কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর মনে একটা চিন্তা অনেকদিন থেকেই ঘোরাফেরা করছিল। ঠিক বুঝেও যেন তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শ্যামলের কথার দৃঢ়তা তাঁর সেই চিন্তার উপর ঘন ছায়া বিস্তার করলো।

শিউরে উঠলেন মন্দাকিনী। তাঁর অনুমান যদি সত্য হয়, তবে ?

সুশ্বেতার মত মেয়েকে বধূরূপে পাওয়া সৌভাগ্য। কিন্তু ওর অতীতের কলঙ্কিত ইতিহাস কি কেউ ভুলতে পারবে ?

সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে মন্দাকিনী সুশ্বেতাকে ভালোবাসেন। তাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে তাঁর মনে একটুও দ্বিধা নেই। কিন্তু শ্যামলের বাবা আর পিসী-মাসীর দল ? তাঁরা যে এমন মেয়েকে বৌ করে ঘরে তুলবেন না—একী আর মন্দাকিনী জানেন না ?

বিচিত্র মানুষের মন !

একটা গভীর মমতায় মন্দাকিনীর অন্তরটা দুলে উঠলো। শ্যামল যে কখন্ চলে গেছে তিনি একটুও বুঝতে পারেননি।

*

* *

সুবর্ণরেখা। খরস্রোতা পাহাড়ীয়া নদী।

উপলখণ্ড বুকে করে সুবর্ণরেখার স্রোত ছুটে চলেছে। জায়গাটা বেশ সুন্দর আর কেমন রহস্যময়। নদীর ওপরকার ব্রীজটা পার হয়ে গেলেই এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে।

পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকা-বাঁকা পথ। দুপাশে সবুজ বনানী। দিগন্তে নীলাভ ছায়া ! পাহাড়ের উপর মেঘ জমে কেমন যেন ধূসর দেখাচ্ছে। ওরা কয়েকদিন হলো জামসেদপুর শহরে বেড়াতে এসেছে।

পাহাড়ের বুকের প্রগাঢ় শ্যামলিমা সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় কেমন মোহময়ী রূপ ধারণ করেছে। একদিকে প্রকৃতির নিবাবরণ রূপ, অন্যদিকে মানুষের হাতে গড়া শহরের আলো ঝল্‌মলে রূপ। মনে তন্ময়তা আনে এ দৃশ্য।

নির্জনতা আর কোলাহল। আদিম সৌন্দর্য আর আধুনিক সভ্যতা! ওরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এলোমেলো বাতাসের ঝাপটায় শাড়ীর আঁচল উড়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক।

হঠাৎ একসময় স্বপ্না বললে—চলো যাই দাদা—

—হ্যাঁ, চল্। অনুপ কোথায়?

—এই যে আমি এখানে!—অনুপ জবাব দিলে। ছায়ায় ঢাকা জলের দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ আছে অনুপ।

কী শুনছে সে?

জলকল্লোল ধ্বনি? না, নিস্তব্ধ নদীর অন্তরের ভাষা?

স্বপ্না এসে পেছনে দাঁড়ালো। আলতোভাবে অনুপের কাঁধ ছুঁয়ে বললে—চলো ঘরে যাই।

চকিতে স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে অনুপ বললে—হ্যাঁ, চলো।

দুজনে সবুজ ঘাসের বুকের উপর দিয়ে চলতে লাগলো।

হঠাৎ একসময় শ্যামল বললে—অনুপ, কবে ফিরে যাচ্ছো তুমি?

—কাল।

—আবার তো শীগগিরই ফিরতে হবে তোমায়।

অনুপ এবার কোনো জবাব দিলে না।

উত্তর দিলো রাণু। বললে—শ্যামলদা, আপনি তো জানেন আসছে মাসের সাতাশে দাদার বিয়ে।

—ও, তাই নাকি?—কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বললে শ্যামল।

স্বপ্না ওদের কথা শুনে লজ্জায় রক্তিমমুখে সকলের আগে পথ চলতে সুরু করলো।

শ্যামলের কাজের চিঠি এসেছে মাদ্রাজে। কিছুদিন কাজ করবার পর বিদেশ যাত্রার অভিলাষ রয়েছে। নিজের দেশের যা আছে তা ভালো করে জেনে তবেই অন্য দেশে যাবে শ্যামল। তবে স্বপ্নার বিয়ের পর।

শ্যামল এখন বিয়ে করবে না আপত্তি জানাতেই বিয়ের কোনো কথা আর ওঠেনি।

বিয়ের তারিখ ক্রমে এগিয়ে আসছে। ঘটাও হবে। একমাত্র মেয়ে স্বপ্না। অনুপও সুপাত্র। বহু কুমারীর কাম্য।

কয়েকদিন ধরে বিয়ের জিনিসপত্র কেনাকাটার ধুম লেগে গেছে। প্রায় সবকিছুই জোগাড় হয়েছে।

মন্দাকিনী স্বপ্নাকে নিয়ে দোকানে গেছেন কয়েকটা শাড়ী কিনতে। আত্মীয়-স্বজনের দল এখনও কেউ আসেননি। বাড়ীটা নিস্তব্ধ।

শ্যামল নিজের ঘরে বসে বসে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। কি অসীম শূন্যতা ওই আকাশে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো সুশ্বেতার কথা। মনের ভেতর প্রবল আলোড়ন জেগে উঠলো। ধীরপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সুশ্বেতার ঘরের সামনে এসে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর ভেজানো দরজা ঠেলে শ্যামল ঘরে এলো।

শব্দ হতেই সুশ্বেতা চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলো—শ্যামল। সমস্ত মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে।

শ্যামলের মুখে এক ঝলক মধুর হাসি। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সুশ্বেতার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

একটু নত হয়ে সুশ্বেতার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তার কপালে হাত রেখে প্রশ্ন করলো—এখন কেমন আছো?

থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো সুশ্বেতা। সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগলো। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললে—ভালো। আপনি এখানে? বাড়ীতে কেউ নেই—

—তাতে কি! ভয় পাচ্ছো কেন?

—না, আপনি শীগগির যান। যে-কেউ হয়তো এখুনি এখানে এসে পড়তে পারে।

—আমি জানি কেউ আসবে না। তাছাড়া মা আর স্বপ্নাও ঘরে নেই।

বলেই বিছানার একপাশে বসে পড়লো শ্যামল।

সুশ্বেতা ভয়ে ও লজ্জায় একেবারে জড়সড় হয়ে পড়লো।

শ্যামল বললে—আচ্ছা শ্বেতা, আমি যে তোমায় নাম ধরে ডাকি, কিছু মনে করো না তো!

লজ্জার লাল আভা সুশ্বেতার জ্বরতপ্ত মুখে ছড়িয়ে পড়লো। নতমুখে বললে—আপনি যা খুশী বলবেন তাতে আমার মনে করার কী আছে?

—শ্বেতা, অনেক ভেবে দেখেছি, তোমার কাছ থেকে নিজেকে আমি বিচ্ছিন্ন করতে পারবো না।

—কিন্তু···আমি যে নিরুপায়!

সুশ্বেতার একখানা হাত সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে শ্যামল বললে—এটা প্রকৃতির নিয়ম। একে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

—কিন্তু মাসীমা-মেসোমশায়ের কাছে যে আর আমার লজ্জা রাখবার মত স্থানটুকুও থাকবে না। তাঁরা আমায় দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন। আশ্রিতা হয়ে এতবড় অন্যায় করবো! লোকে শুনলে কি বলবে!

—লোকে যা বলার তা বলবেই। আমার ধারণা, যেটা ন্যায় বলে ভাববো তাই করবো আমরা!

সুশ্বেতা কোনো উত্তর দিলে না।

শ্যামল বললে—আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

সুশ্বেতা চোখ তুলে তাকালো। বললে—যদি আমার সাধ্য থাকে, রাখবো।

—আমি খুব শীগগির মাদ্রাজ চলে যাচ্ছি। কথা দাও, তুমি তোমার অতীত জীবনের জন্যে মন খারাপ না করে লেখাপড়া করবে মন দিয়ে।

সুশ্বেতা কি উত্তর দেবে ঠিক বুঝতে পারে না। মুখটা আবার নামিয়ে নিলে নীচের দিকে।

শ্যামল বললে—বলো, কথা দাও।

একটু কি ভেবে উত্তর দিলে—করবো।

—জানো শ্বেতা, আমি কিন্তু মেয়েদের উগ্রতার চেয়ে কোমলতাই বেশী পছন্দ করি। তবে যা শেষ হয়ে গেছে, তাকে নতুন করে ডেকে এনে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলাটা আদৌ ভালোবাসি না! তাই অতীতের সবকিছুকে ভুলে গিয়ে বর্তমানকে সুষমায় ভরে তুলতে হবে তোমায়।

কালো সজল চোখদুটি তুলে তাকালো সুশ্বেতা।

শ্যামল বললে—আমি দূরে চলে যাবার আগে তোমার কাছ থেকে তোমার মনের কথাটাই শুনে যেতে চাই।

সুশ্বেতার সারা দেহে যেন মধুর রোমাঞ্চ জেগে উঠলো। আত্মবিস্মৃত হয়ে বললে—সংসারে আমার মত মেয়েকে কে স্থান দেবে? একে দুর্ভাগা, তার ওপর…

—বলো শ্বেতা, তোমার জীবনের সব কথা শুনবো। আমি জানি তুমি শুভ্র, নির্মল ও পবিত্র।

সুশ্বেতা একে একে তার জীবনের সব কথা খুলে বললে।

সব শুনে শ্যামল ব্যথিতকণ্ঠে বললে—যা শেষ হয়ে গেছে, তাকে শেষ করে দেওয়াই ভালো। আচ্ছা, এখন যাই।

বলে শ্যামল উঠে পড়লো। দরজার কাছে আসবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো সুশ্বেতার অশ্রুসিক্ত টানা টানা চোখদুটি। যেন বর্ষার সজল আকাশের মত প্রগাঢ় দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘন লাল রঙের শাড়ীখানা তার শ্বেতশুভ্র

দেহবল্লরীকে জড়িয়ে রয়েছে। রাঙা ঠোঁটের কোণে দামিনীর মত হাসি। জ্বরতপ্ত মুখখানা যেন তাকে সহস্র কণ্ঠে সাদরে আহ্বান করছে।

শ্যামলের মনে কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিলে!

নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলে না। চকিতে দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো। বসে পড়লো সুশ্বেতার বিছানার ওপর।

সুশ্বেতা তাকালো বিহ্বল দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে।

সহসা নত হয়ে শ্যামল দুহাত দিয়ে সুশ্বেতাকে জড়িয়ে ধরে সবলে নিজের প্রশান্ত বুকে টেনে নিয়ে তার মুখখানা ধরে আকুল আবেগে বলে উঠলো—বলো শ্বেতা, আমার মনের কথা তুমি কি একটুও বুঝতে পারো না।

মুহূর্তে সুশ্বেতার সমস্ত চেতনা কোথায় হারিয়ে গেল। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো—দয়া করে ছেড়ে দিন আমায়।

—কেন ছেড়ে দেবো?

বলে শ্যামল সুশ্বেতার সুগৌর কপোলের ওপর নিজের মুখখানা নত করলো।

সুশ্বেতা বললে—এখুনি যদি কেউ দেখে ফেলে, তাহলে আমাকে চিরদিনের জন্য এ আশ্রয়টুকুও হারাতে হবে।

—কেন হারাতে হবে! যদি বলি চিরদিনের জন্যে তোমার এখানেই স্থান হবে!

সুশ্বেতা কোনো জবাব দিলে না।

ওকে ছেড়ে দিয়ে শ্যামল বললে—আমি জানি শ্বেতা, তুমি আমার। তোমার মনের সেই কথাটাও আজ আমার আর অজানা রইলো না। আমার মনে যে প্রশ্ন জেগে উঠেছে, আমি এখন তার উত্তর পেয়েছি।

সুশ্বেতার দুর্বল শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

শ্যামল ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে বললে—কেঁদো না শ্বেতা !

করুণ সুরে সুশ্বেতা বললে—আমি জন্ম-দুর্ভাগিনী। আমার কেউ নেই বলে কি এমন করলেন আমায় ?

এবারে শ্যামল হেসে ফেললো, বললে—তা, তা নয়। তোমার মনে শুধু আমার ভালোবাসার চিহ্ন এঁকে দিলাম।

সুশ্বেতা আর কিছু বলতে পারলো না। নিঃশব্দে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলো।

শ্যামল উঠে চলে গেল।

*

* *

স্বপ্নার বিয়ের আগের দিন !

সারা বাড়ী ভরে গেছে আত্মীয়-কুটুম্বের দলে। গম্ গম্ করছে বাড়ীটা।

মাঙ্গলিক সানাই বাজছে একটানা সুরে।

চারদিকে হৈ-চৈ। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির আর অন্ত নেই। সবকিছু মিলে বিচিত্র রসের সৃষ্টি করেছে !

স্বপ্নার মামার ওপরই খাওয়া-দাওয়ার তদারকের ভার পড়েছে।

কাজের বাড়ী। সকলেই ব্যস্ত। এদিকে মন্দাকিনীর বিশ্রাম নেই। যেদিকে না যাবেন সেদিকেই গণ্ডগোল।

একটু কাজের অবসর মিলতেই স্বপ্নার দিদিমা মেয়েকে আড়ালে ডাকলেন।

খোলা ছাদ।

ওদিকের কোণে এক জায়গায় মা মেয়েকে ডেকে বসালেন। বললেন—শোন্ মন্দা, এদিকে এসে বোস্।

মন্দাকিনী মায়ের কাছে বসলেন। বললে—যা বলবার একটু তাড়াতাড়ি বলো মা। ওদিকে আবার তোমার জামাই ডাকাডাকি সুরু করে দেবে।

—আচ্ছা মন্দা, তুই কি চিরদিন একরকমই থাকবি ?

অবাক হয়ে মন্দাকিনী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন, কি হয়েছে ?

—কি হয়েছে তাও বুঝিস না! বলি, ওই আগুনের চুবড়ি কেন ঘরে ঠাঁই দিয়েছিস ?

—কী বলছো, সোজা কথায় বলো।

—হরণ করে নিয়ে যাওয়া ওই মেয়েকে কেন ঘরে রেখেছিস্। তাড়িয়ে দে, শীগগির তাড়িয়ে দে। বাবাঃ, ওই আগুনের মত রূপ! ও-রূপে মুনিরও মন টলে। তাছাড়া ওর স্বভাব-চরিত্তির কি আর ভালো আছে, না থাকতে পারে কখনো। আমি বলছি, তোর সংসারে ও আগুন লাগাবে।

ঠিক সেই সময় ছাদের এপাশ দিয়ে সুশ্বেতা যাচ্ছিল পানের থালা নিয়ে। দিদিমার শেষের কথাগুলো কানে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর এক পা-ও এগোতে পারলো না। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো তাদেয় কথা

মন্দাকিনী বললে—না মা, মেয়েটি কিন্তু বড়ঘরের। লেখাপড়াও জানে, তবে বড় দুঃখী। দুষ্টলোকেরা হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, একথা সত্য। কিন্তু ও নিষ্পাপ। আর ওইটকু মেয়ের সাহসের কথা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

—তবে আর কি! তাহলে ওই মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ বরণ করে ঘরে তোল্। আমরাও সবাই মিলে আনন্দে উলুধ্বনি দেবো।

মন্দাকিনী বললে—তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে হয়তো তাই-ই হতো।

দিদিমা এবার রেগে উঠলেন ! বললেন—দে না, কে আর বারন করছে !—বলে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

মায়ের রাগ দেখে মন্দাকিনী আর কোনো কথা বলতে সাহস পেলে না।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

এবারে দিদিমা ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন—আচ্ছা, তোরা নাহয় আশ্রয় দিয়েছিস্ ভালো করেছিস্, তাই বলে আবার পটের বিবি সাজিয়ে রাখা কেন ? কোথায় নীলাম্বরী শাড়ী, গয়না, হেন, তেন ! এসব কি ! এতবড় বংশে চুনকালি পড়লে বুঝি শান্তি হবে তোর ? নির্মল নেহাৎ ভালোমানুষ, তাই তুই এতটা সাহস করতে পেরেছিস। কিন্তু আমি বলছি, যদি ভাল চাস্ তো শীগগির বিদেয় কর্ ওই মেয়েকে।

কথাগুলো শুনেই সুশ্বেতার মাথার ভেতরটা হু হু করে উঠলো। সারা শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে এলো। পানের থালাটা হাত থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হতেই তাড়াতাড়ি সামনে নিলে।

হঠাৎ মামার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়—কই রে, কে পান আনতে গেলি। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়।

চমকে উঠলো সুশ্বেতা। ত্রস্তপদে নেমে গিয়ে পানের থালাটা মামার হাতে দিয়ে টলতে টলতে কোনোরকমে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

এতক্ষণ সুশ্বেতার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এবারে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

দরজা বন্ধ করলেও দিদিমার কথাগুলো যেন এখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে—তাড়িয়ে দে। তাড়িয়ে দে !

সুশ্বেতার মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে ঝাপসা অন্ধকার দেখতে লাগলো। সেইখানেই মেঝেটা ধরে বসে পড়লো।

বিরাট শূন্যতায় ভরে উঠলো দেহ-মন। কি করবে সে ?

পালিয়ে যাবে কোথায় ?

কিন্তু কোথায় যাবে ! কে তাকে আশ্রয় দেবে ।

তবে কি আত্মহত্যা করবে সুশ্বেতা ? জীবনের কাছে হেরে গেছে সে। এছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই। তার গতিহীন জীবনে শুধু বিড়ম্বনাই সার হয়ে রইলো।

কিন্তু শ্যামল ? সে কি সত্যিই ভালোবাসে সুশ্বেতাকে ? সেও কি শ্যামলকে ভালোবাসে না ?

নাঃ, সুশ্বেতার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত। একটা সোনার সংসার নষ্ট করে দেবার অধিকার তার নেই।

একী অন্তরের জ্বালা ! যে জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরছে ?

সুশ্বেতা কি জানে না, শ্যামল তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে !

জানে, নিশ্চয়ই জানে। আর এও জানে যে, তার সৌভাগ্যের রবি চিরতরে অস্তমিত হয়েছে কলঙ্কের কালো মেঘে।

শ্যামল তো ওকে জীবনসঙ্গিনী করতে ইচ্ছুক, কিন্তু এ-বিয়ে করতে হলে শ্যামলকে সকলের বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে। আত্মীয়-স্বজনের দীর্ঘশ্বাসে কি ওরা সুখী হতে পারবে ?

অন্তরের দুঃখভরা বেদনাময় অভিশাপ কখনও কল্যাণ আনতে পারে না। তার চেয়ে ও এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। এতবড় পৃথিবীতে কি এতটুকু স্থান পাওয়া যাবে না।

চলে গেলে হয়তো ভুলে যাবে শ্যামল সুশ্বেতাকে। ভুলে যাবে তার প্রেমকে ।

যখন অমিতা বধূবেশে ওর পাশে এসে দাঁড়াবে, তখন ওর জীবন সুন্দর ও সরস হয়ে উঠবে। একটি মেয়ের শোক আর-একটি মেয়ে অনায়াসেই ভুলিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া অমিতা সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং ধনীর দুলালী।

ভাবতে গিয়ে সুশ্বেতা অস্থির হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলো।

*

* *

খুব আড়ম্বর করেই স্বপ্নার বিয়ে হয়ে গেল।

স্বপ্না শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। আত্মীয়-স্বজনও একে একে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে।

কয়েকদিন আগের উৎসবমুখর যে-বাড়ীটা হৈ-হল্লা আর মানুষের আনাগোনায় জমজমাট হয়ে ছিল, আজ সেই বাড়ীই অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

শ্যামলও কয়েক দিনের মধ্যেই মাদ্রাজ চলে যাবে।

সেদিন দোতলার ছাদে হেলান দিয়ে বসেছিল সুশ্বেতা। মনটা গভীর বেদনায় ভরা।

মন্দাকিনীর মনটাও কয়েকদিন বেশ ভালো নয়। হয়তো স্বপ্না শ্বশুরবাড়ী চলে যাওয়ায় এরকম হয়েছে।

সুশ্বেতা কথা বলতে গেলে মন্দাকিনী কেমন যেন বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আগের মত খুসীভাব নেই।

কে জানে কি হয়েছে! সুশ্বেতা কিছুই বুঝতে পারে না।

ছাদের চারদিকে সারিবদ্ধ ফুলের টব। ফুটেছে লাল-নীল নানা রঙের অজস্র ফুল।

রোজ সন্ধ্যার আগে সুশ্বেতা ঝারি দিয়ে ফুলগাছগুলোতে জল দেয়। এ তার নিত্যকার কাজ।

আজও সে এসেছে ঝারি নিয়ে। আসন্ন সন্ধ্যায় চারদিকে কেমন যেন একটা সকরুণ স্তব্ধতা।

মনে পড়লো, শ্যামল কাল সত্যিই চলে যাবে।

সুশ্বেতার মনটা খাঁ খাঁ করে, নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো। একটা গভীর বেদনায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ছাদ থেকে পথ চোখে পড়ে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পথের দু'ধারে সমান্তরালভাবে ছোট ছোট নিম, দেবদারু প্রভৃতি ছায়া-তরুর সারি। এ মানুষের হাতে গড়া—সযত্নে রোপন করেছে। এও কি প্রকৃতির দান নয়।

বড় বড় বাড়ীগুলোর মাথার উপরে উঁকি দেয় গর্বিত সুনীল আকাশ।

পথে অজস্র বাস, লরী, মোটর রিক্সা, ঠেলাগাড়া অশ্রান্ত-ভাবে ছুটে চলেছে মানুষের গতিমুখর আনাগোনা।

চারদিকে কর্মচাঞ্চল্যের শ্রোত বয়ে চলেছে। তবুও কেমন যেন নিঝুম বলে মনে হচ্ছে সুশ্বেতার।

ঝারিটা দুহাতে ধরে ফুলগাছগুলোয় জল দিতে দিতে ছাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সহসা মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কে ? কে যেন কাঁদছে ! চাপা কান্না।

ঝারিটা তাড়াতাড়ি মাটিতে নামিয়ে রেখে কি যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলো—কই, কেউ তো নয় ! তবে কে কাঁদে অমন করে ?

নিজেকে খুঁজে বেড়ায় সুশ্বেতা।

এবার জানতে পেরেছে কার এমন কান্না !

কাঁদে সুশ্বেতার অন্তরাত্মা। অবরুদ্ধ বেদনায় সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তে-রাস্তার মোড়ে এসে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কখন যে শ্যামল এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে, একটুও টের পায়নি সুশ্বেতা।

অব্যক্ত বেদনায় উত্তেজিত হয়ে সুশ্বেতা ছাদের কার্নিশে দুই কনুই রেখে গালে দুটো হাত দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে।

হঠাৎ সুশ্বেতা পেছন ফিরলো। শ্যামলকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে—আপনি!

—হ্যাঁ আমি। আশ্চর্য হলে যে?

সুশ্বেতা শান্তকণ্ঠে বললে—কখন এলেন?

—এইতো কিছুক্ষণ। কী ভাবছিলে সুশ্বেতা?

—কই, কিছুই না তো।

শ্যামল বললে—তাহলে অমন তন্ময় হয়ে ছিলে কেন?

সুশ্বেতা কিছুক্ষণ চুপ করে মুখটা নীচু করে মৃদুস্বরে জবাব দিলে—না, আমার ভাববার আর কি আছে।

—তবে?

সুশ্বেতা কোনো উত্তর দিলে না।

সুশ্বেতাকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্যামল বললে—একটা কথা তোমায় বলবো শ্বেতা?

—কি বলবে, বলো।

—শ্বেতা, কাল আমি মাদ্রাজ চলে যাচ্ছি।

—কাল!

—হ্যাঁ।

সুশ্বেতা কোনো প্রশ্ন করলে না! নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে শ্যামলই বললে—আমার যাবার কথা শুনে তুমি কিছু বললে না!

—কি বলবো?

—কিছুই কি বলার নেই?

কি আর বলার আছে তার! সজল কালো দুটি চোখ তুলে তাকালে সুশ্বেতা!

শ্যামল ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলে—বলো শ্বেতা, তুমি আমায় ভুলে যাবে না তো?

—না, কেন ভুলে যাবো।

—চোখের আড়াল হলে আর কি কারুর কোনো কথা মনে থাকতে পারে! তাই····

—না, তুমি তো ভোলবার নও।

শ্যামল আরো একটু এগিয়ে এলো। ওর সুন্দর মুখে-চোখে লুটিয়ে পড়া চুলের গোছা ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে। তারপর গভীর মমতায় বললে—চিঠি দেবে তো?

—চিঠি!

—হ্যাঁ, চিঠি। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটি করে।

—কিন্তু আমি যে···আমি যে···

—তুমি যে কি শ্বেতা?

কি বলতে গিয়ে থেমে যায় সুশ্বেতা। তারপর অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে—আমি···আমি যে অলক্ষুণে। আমার সংস্পর্শে তোমাদের সোনার সংসারে আগুন লাগবে। আমায় তাড়িয়ে দাও।

বলতে বলতে অসীম ধৈর্যশীলা সুশ্বেতা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। সহসা শ্যামলের পায়ের ওপর মুখ রেখে আকুল কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

শ্যামল আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না, ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললে—তুমি আমার শ্বেতা। আর সব ব্যবস্থাই আমি করবো।

থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো সুশ্বেতা। শ্যামলের বুকের মধ্যে মাথা রাখলো। কিন্তু মুহূর্তে অসাড় দেহলতিকা এলিয়ে পড়লো। দু'চোখ নিমীলিত।

শ্যামল বুঝতে পারলো যে, অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়েছে সুশ্বেতা।

বুকের মধ্যে স্পন্দন জাগলো শ্যামলের। ওকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল মাকে খবর দিতে।

মন্দাকিনী ছুটে এলেন ছাদে ! দুজনে ধরাধরি করে সুশ্বেতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো।

ডাক্তার এলেন। চিকিৎসার কোনো ত্রুটিই হলো না।

নির্মলবাবু নিজে সুশ্বেতার মাথার সামনে চেয়ারে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

মন্দাকিনী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখছেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার তখন সুশ্বেতার নাড়ীটা ভালোভাবে পরীক্ষা করছেন।

সব কিছু দেখে ডাক্তারবাবু বললেন--বিশেষ কিছু নয়, শুধু হার্টটা খুব দুর্বল। আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। আশা করি এতেই ভালো হবে।

ডাক্তার চলে গেলেন।

সুশ্বেতার মুখের দিকে চেয়ে মন্দাকিনী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সুশ্বেতা চোখ খুললো।

মন্দাকিনী হাতটা টেনে নিয়ে বুকের ওপর রাখলেন।

সুশ্বেতাকে চোখ মেলতে দেখে নির্মলবাবু ডাকলেন—শ্বেতা, এখন কেমন আছো মা !

অবশ চোখদুটো তুলে সুশ্বেতা তাকালো নির্মলবাবুর দিকে। বললে—ভালো। কিন্তু এ আমি কোথায় ?

—আমার বাড়ীতে। তোমার মাসীমার কাছে।

—মাসীমা কোথায় ?

—এই যে আমি এখানেই রয়েছি !—মন্দাকিনী ঝুঁকে পড়ে জবাব দিলেন।

—মাসীমা !

—কি বলছিস শ্বেতা !

ভয়ার্ত স্তিমিত চোখ তুলে মন্দাকিনীর দিকে তাকিয়ে সুশ্বেতা বললে—আমার যে বড় ভয় করছে।

—কীসের ভয় ?

—আমি যে অলক্ষুণে মেয়ে। আমায় আপনারা এখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন না তো ?

এতক্ষণ মন্দাকিনী উদ্বিগ্নচিত্তে কথা বলেছিলেন, এবার তাঁর মুখে হাসি ফুটলো। বললেন—পাগল মেয়ে। তুই আমার লক্ষ্মী।

সুশ্বেতা মনে মনে আশ্বস্ত হলো। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পরম শান্তিতে যেন আবার চোখ বুজলো।

রাত অনেকটা হয়েছে। সুশ্বেতা ঘুমিয়ে আছে। কাছে কেউ নেই।

শ্যামল এলো অতি সন্তর্পণে ঘরের দরজা ঠেলে। সুশ্বেতার কপালে হাত রাখলো।

ঘরে নীলাভ আলো জ্বলছে। হাল্‌কা নরম আলোয় সুশ্বেতাকে কী সুন্দর লাগছে!

শ্যামল খুব আস্তে সুশ্বেতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলো—শ্বেতা!

ঘুমের ঘোর কেটে গেল সুশ্বেতার। চমকে ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—কে ?

—আমি।

—ও, তুমি ?

বলেই শ্যামলের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে।

শ্যামল সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করলো, বললে—হ্যাঁ, আমি। কিন্তু কী দেখছো অমন করে ?

—দেখছি তোমাকে।

—আমাকে।

—হ্যাঁ। তুমি কি সত্যিই চলে যাচ্ছো?

শ্যামল বললে—হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে আবার তো শীগগিরই ফিরে আসবো।

—কিন্তু আমার কি হবে? আমায় যদি এঁরা তাড়িয়ে দেয়, কোথায় যাবো আমি?

সুশ্বেতার চোখে-মুখে ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠলো। ফ্যাকাশে মুখখানা নামিয়ে নিলে।

শ্যামল ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—ভয় কি। মা কি তোমায় কখনও তাড়িয়ে দিতে পারেন? আর আমি তো রয়েছি। সবকিছু জানিয়ে আমায় চিঠি দিও।

সুশ্বেতা চুপ করে রইলো।

শ্যামল বললে—কোনো দুঃখ করো না শ্বেতা! বলো, আমি যা বললাম তাই করবে।

মাথাটা নীচু করে সুশ্বেতা কোনোরকমে বললে—হ্যাঁ, করবো।

শ্যামল একবার তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে হাসিমুখে নিঃশব্দে নিজের ঘরে গেল।

পরদিন শ্যামল মাদ্রাজ চলে গেল। সুশ্বেতার কাছে চারদিকই যেন শূন্য মনে হতে লাগলো।

*

*   *

দেখতে দেখতে কিছুদিন কেটে গেল।

শ্যামল কাজে খুব সুনাম অর্জন করেছে! এই তরুণ বাঙালী অফিসারে ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ! কিছুদিন পরেই ওকে এখান থেকে বিদেশে পাঠানো হবে।

শ্যামল চিঠি দিয়েছে বাড়িতে। চিঠিতে মাকে তার বিদেশে যাওয়ার সংবাদ জানিয়েছে।

খুব শীঘ্রই আসছে সে। বিদেশ যাত্রার আগে বাবা-মার কাছে সব কথা খুলে বলবে।

আপত্তি হয়তো কেউ কেউ করতে পারেন। কিন্তু সে সেই আপত্তিকে জয় করতে পারবে—এ বিশ্বাস তার মনে আছে।

অমিতাকে বিয়ে করবে না—এমন কথা মুখ ফুটে না বললেও ছেলের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন মন্দাকিনী। নিজেরও এক এক সময় ইচ্ছা হয় সুশ্বেতাকে ঘরের লক্ষ্মী করে রাখেন।

বড়ঘরের মেয়ে। লেখাপড়াও জানে। বাপও মস্ত বিদ্বান ও মানী লোক ছিলেন।

তবে····তবে আর বাধাই বা রইলো কোথায়? কিন্তু স্বপ্না বা নির্মলবাবু রাজী হবেন না।

মন্দাকিনী ভাবলেন একবার অবসরমত নির্মলবাবুর কাছে কথাটা উঠিয়ে দেখবেন। তাহলে ওর মনের সত্যিকারের কথাটা জানতে পারবেন।

সুশ্বেতার কাছেও প্রতি সপ্তাহে চিঠি আসে। কেউ জানতে পারে না।

সুশ্বেতাও সেসব চিঠির উত্তর লিখে জানায় শ্যামলকে।

সেদিন কাজের শেষে খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসেছিলেন নির্মলবাবু।

মন্দাকিনী এসে সেখানে বসলেন।

নির্মলবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—কী খবর?

—আমার আবার খবর কি?

—কেন? সুপুত্র ও সুপুত্রীর জননী তুমি—

—আর তুমি ?

—আমি ?—হো হো করে হেসে উঠলেন নির্মলবাবু।

মন্দাকিনী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—একটা খবর শুনেছো ?

—কি ?

—শ্যামল নাকি খুব শীগগির বিদেশে যাবে ?

—তাইতো একরকম ঠিক হয়ে রয়েছে।

—আমি বলছিলাম কি···

—কি, বলো।

—যাবার আগে বিয়েটা হয়ে গেলে ভালো হয় না কি ?

—বেশ। পাত্রী তো ঠিক করাই আছে।

—কে ? অমিতা ?

—হ্যাঁ। আমি ওর বাবাকে চিঠি দিচ্ছি। আর তুমিও ওর মাকে চিঠি দাও। ওঁরা তো অনেক দিন থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

—কিন্তু····

—কিন্তু আবার কি ?

—আমার কি মনে হয় জানো ?

—কি ?

মন্দাকিনী কিছুক্ষণ কী যেন ভাবেন। কী বলতে গিয়েও থেমে যান তিনি।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নির্মলবাবু বললেন—কী বলবে বলো না গো—

—আমার কি মনে হয় জানো ?

নির্মলবাবু সহজভাবে বললেন—না বললে কি করে জানবো বলো। আমি কি অন্তর্যামী ?

—না, বলছিলাম কি—

—কি বলবে বলো।

—মেয়েটি কিন্তু বেশ লক্ষ্মী।

—কোন্ মেয়েটি ? অমিতা তো ? হ্যাঁ, বেশ লক্ষ্মী।

মন্দাকিনী হঠাৎ বলে ওঠেন—না না, অমিতার কথা নয়।

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে নির্মলবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তবে ? তবে তুমি কার কথা বলছো ?

মন্দাকিনী একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন—আমি···· আমি সুশ্বেতার কথা বলছি।

নির্মলবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ততোধিক বিস্ময়ে বলে উঠলেন—কি বললে ? সুশ্বেতা !

—হ্যাঁ। ওর সঙ্গে মানাবে ভালো।

মাঝপথে স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন নির্মলবাবু—এসব কী বলছো তুমি ? পাগল হয়ে গেছো নাকি মন্দা ?

—কেন, পাগল হবো কেন ?

—না হলে এমন কথা উচ্চারণ করলে কী করে ?

—সুশ্বেতার মত ক'টা মেয়ে আছে এ সংসারে ?

—ওকে আমিও যথেষ্ট স্নেহ করি মন্দা। তাই বলে আমি আমার ছেলের বৌ করতে পারবো না।

—সত্যি, মেয়েটা বড় দুর্ভাগিনী। কিন্তু অমন সুন্দর ফুলের মত মেয়ে।

—সেকথা আমিও স্বীকার করি।

মনে মনে কী ভেবে নিয়ে মন্দাকিনী স্তিমিতকণ্ঠে বললেন—আমার মনে হয় শ্যামল সুশ্বেতাকে ভালোবাসে।

—এ্যাঁ, কী বললে ?—নির্মলবাবু আর্তকণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন।

—আমি মা, আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। খোকা শ্বেতাকে ভালোবাসে !

নির্মলবাবু কিছুক্ষণ আর কোনো কথা বলতে পারেন না। নিশ্চল পাথরের মত শুধু স্তম্ভিত-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন মন্দাকিনীর মুখের দিকে।

মন্দাকিনীও কোনো জবাব দিলেন না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন নির্মলবাবু। কঠিন স্বরে বললেন—শ্যামল ভুল করেছে, একথা তাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও মন্দা। যে-মেয়ে হাত বদল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার আশ্রয়ে এসেছে—তার রূপ গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তার নারীত্বের যে শ্রেষ্ঠত্ব তা সে হারিয়েছে। আর ওই মেয়েকেও জানিয়ে দিও যে, তার স্পর্ধা আমাকে বিস্মিত করেছে। এ আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না।

মন্দাকিনী রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—সব দোষই কি ওর একার?

কঠিনকণ্ঠে নির্মলবাবু জবাব দিলেন—দোষ গুণ বিচার করতে আমি বসিনি মন্দা।

—তবে ওকে তুমি কি করতে চাও?

—ওকে অন্যত্র রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে।

মন্দাকিনী এবারে ব্যস্ত হয়ে বললে—ওগো, তুমি একী বলছো?

—ঠিকই বলছি। আর তোমার মাও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন।

—সুশ্বেতার কি অপরাধ? ঘটনাচক্রে মানুষকে কত দুঃখ-কষ্টে না পড়তে হয়। গুণ্ডারা ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেলেও সুশ্বেতা নিজের নারীত্বকে বাঁচিয়েছে।

—তুমি যত খুশী উদার হতে পারো, কিন্তু আমি বা আমার আত্মীয়-স্বজনও তোমার মত উদার নন। সমাজে বাস করতে হলে তাদের বাদ দিয়ে আমি চলতে পারি না—পারবোও না।

—তাহলে কি ওকে তাড়িয়ে দেবে?

—না তাড়ালেও অন্য একটা কিছু বন্দোবস্ত করতেই হবে। নিজেকে ভুলে শ্যামলকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখাও ওর পক্ষে বাতুলতা, এটা ও তাকে বুঝিয়ে দিও।

নির্মলবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত মুখটা থম্ থম্ করছে একটা চাপা ক্রোধে।

মন্দাকিনী বললেন—ওর জন্য আমি একা দুঃখ প্রকাশ করে কি করবো। তবে তোমায় একটা অনুরোধ করছি, রাখবে ?

—সাধ্য হলে রাখবো।

—একটু চেষ্টা করে ওর আগের কথা গোপন রেখে বিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত বিদেয় করে দাও। কিছু টাকা না হয় খরচ হবে তোমার।

নির্মলবাবু বললেন—সেই ভালো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি চেষ্টা করছি।

নির্মলবাবু চলে গেলেন। মন্দাকিনী তাঁর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

* *

অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন নির্মলবাবু।

কয়েকদিন খুব ঘোরাঘুরি করে শেষে এক জায়গায় একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন।

ছেলেটি শিক্ষিত। বি-এ পাস। কোন অফিসে কেরানীর কাজ করে। মধ্যবিত্ত অভিজাত ঘরের সন্তান। স্বাস্থ্য বেশ ভালো। সুদর্শন।

নির্মলবাবু পাত্রের পিতা হরিশবাবুকে বলে এসেছিলেন যেন তিনি নিজে গিয়ে দেখে পছন্দ করে আসেন।

চপল ছন্দে দিন চলে যায়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ছাদের একপাশে আবছা আলোয় এসে দাঁড়ালো সুশ্বেতা।

ওর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে একথা সে মন্দাকিনীর কাছ থেকে শুনেছে!

বিয়ের নামে মেয়েদের মন নাকি আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু কই, সুশ্বেতার মনে তো একবিন্দুও আনন্দ আসছে না?

ধীরে ধীরে ওর মনে গভীর আলোড়ন জাগে। না, সুশ্বেতা চলে যাবে এই মাটির পৃথিবী ছেড়ে, কিন্তু তবুও জীবনে প্রিয়তমকে সমাজে নীচু করতে পারবে না।

বারান্দার রেলিং-এ দু'হাতের কনুই রেখে উপুড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুশ্বেতা।

—শ্বেতা!

হঠাৎ মন্দাকিনীর স্নেহমাখানো কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে তাকালে সুশ্বেতা।

সুশ্বেতার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনী উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে শ্বেতা? শরীরটা কি আবার খারাপ হলো নাকি?

—না মাসীমা, শরীর আমার ভালোই আছে।

—তবে অমন শুকনো বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন?

সুশ্বেতা কোনো জবাব দিলে না।

মন্দাকিনী বলতে লাগলেন—সব কথা শুনেছিস শ্বেতা। তোকে ওরা খুব পছন্দ করেছেন।

সুশ্বেতা কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আঙুলে শাড়ীর খুঁট জড়াতে লাগলো।

—বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গেছে। আমি আশীর্বাদ করছি, রাজরাণী হও মা।

সহসা সুশ্বেতা এক কাণ্ড করে বসলো। মন্দাকিনীর দু'পায়ে মাথা রেখে কেঁদে বলে উঠলো—মাসীমা গো, আপনি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

—তাড়িয়ে দিচ্ছি কি রে শ্বেতা ? মেয়েদের ওটাই তো বড় আশ্রয়স্থল।

—ওরা তো আমার পূর্বের পরিচয় নিশ্চয়ই জানেন না।

—না। জানানোর প্রয়োজনই বা কি ? আমরা বলেছি আমাদের আত্মীয়া !

—কিন্তু ওরা যদি জানতে পারেন ?

—না, পারবেন না।

—মাসীমা !

এবারে মন্দাকিনী সুশ্বেতার চিবুক ধরে মুখখানা তুলে বললে—সব বুঝি, কিন্তু কি করবো মা !

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—আপনি যদি সবই বুঝতে পেরে থাকেন তবে বলুন, এস্থলে আমার কর্তব্য কি ?

—তুই এক কাজ কর্....

কথাটা বলতে গিয়ে মন্দাকিনীর প্রাণটা ব্যথায় ভরে উঠলো।

বললেন—দুর্বলতাকে জয় করবার মত শক্তি তো তোর আছে, আমি জানি। তাই বলছি, অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে শুধু আমার সংসারটাকে নষ্ট করে দিসনে। আমার একমাত্র ছেলে শ্যামলকে তোর প্রভাব থেকে মুক্ত করে দে।

সুশ্বেতার কণ্ঠ কে যেন সজোরে চেপে ধরেছে। শুধু অশ্রুর নদী নেমে এলো দু'চোখ দিয়ে।

মন্দাকিনী সেদিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

*

* *

আজ সুশ্বেতার বিয়ে।

সন্ধ্যার আগে থেকেই মাঙ্গলিক সানাই বাজছে। কয়েকজন লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বিকেলের গাড়ীতে কলকাতা থেকে বর এসেছে। সঙ্গে পাত্রের পিতা, পুরোহিত, নাপিত, বন্ধু-বান্ধব সব মিলিয়ে জন-পনেরো।

নির্মলবাবু নিজে সমস্ত দেখাশোনা করছেন। আয়োজন বিরাট না হলেও মন্দ নয়।

সকালবেলা শ্যামল এসেছে। একটা কথাও কারোর সঙ্গে বলেনি সে। এসেই নিজের ঘরে শুয়ে রয়েছে।

শ্যামল আজ ভাবছে কত কথা।

মা চিঠি দিয়েছিল তোকে এ বিয়েতে আসতেই হবে। না এলে এ বিয়েতে কোনো আনন্দই হবে না।

কিন্তু তার মনে আজ আনন্দ কোথায় ?

মনে পড়লো সুশ্বেতার রূপ। তার সেই আগের জ্বরতপ্ত ঠোঁট দুটি। যে-মুখ তাকে সহস্রকণ্ঠে আহ্বান করেছিল, সে-ই আজ আবার অন্য একজনকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে !

ঘৃণায় ও রাগে শ্যামলের মন সির্ সির্ করে উঠলো। আবার পাশ ফিরে শুলো।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে শ্যামলের ঘুম ভেঙে গেল। দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল বধূবেশিনী সুশ্বেতাকে।

সুশ্বেতা রুদ্ধকণ্ঠে বললে—তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসলো শ্যামল। এ কে ? শ্বেতা ! পরনে লাল বেনারসী, কপালে কনে-চন্দন, সর্বাঙ্গে গহনা—এই নারীই কি সুশ্বেতা ?

শ্যামল কোনো কথা বলতে পারে না। নিশ্চল পাথরের মত চুপ করে বসে রইলো।

সুশ্বেতাই বললে—শেষ বিদায় বেলায় কি একটা কথাও বলবে না তুমি ?

এক অপরূপ উদাস দৃষ্টি মেলে শ্যামল বললে—শেষ তো তুমিই করে দিলে। আমাকে একটুও জানালে না ?

—কোনো উপায়ই যে ছিল না।

—কেন ? অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি তোমার হয়তো ছিল না, কিন্তু আমার ছিল।

—যাঁরা আমার মত একজন অনাথাকে একদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালানোর মত মনোবৃত্তি আমার নেই। সমাজে তাঁদের সম্মান আছে, প্রতিষ্ঠা আছে।

—তোমার কোনো যুক্তিই আমি মানতে পারবো না শ্বেতা। শুধু যাবার বেলায় জবাব দিয়ে যাও, আমার জীবনটাকে নষ্ট করে তোমার কতটুকু সুখ হবে ?

—সুখ! হাসলো সুশ্বেতা।

হাসি তো নয়। কান্নাই বলা চলে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুশ্বেতা ধীরে ধীরে দরজা পার হয়ে চলে গেল।

ওদিকে শাঁখ বেজে উঠলো।

বিয়ের আসর আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। লোকজনও নেহাৎ মন্দ হয়নি। পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই এসেছেন।

পাশের বাড়ীতে বর ও বরযাত্রীরা রয়েছে।

পাত্রকে সাজিয়ে এলো স্বপ্না। কিন্তু দাদা কোথায় ?

স্বপ্না চিন্তিতা হয়ে শ্যামলের সন্ধানে চললো।

দরজা খোলাই ছিল।

স্বপ্না ঘরে গিয়ে দেখলো শ্যামল বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে ডাকলো—দাদা।

—কে?—বলে চমকে মুখ তুললো শ্যামল।

চোখদুটো করমচার মত লাল।

স্বপ্না ব্যস্ত হয়ে কপালে হাত রাখলো। নাঃ। গা তো তেমন গরম নয়! তবে? উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললে—দাদা, ও দাদা! তোমার কী হয়েছে বলো তো?

ওর অস্থিরতা দেখে শ্যামল হাসলো। বললে—কি হবে? কিছুই তো হয়নি।

—তবে এসেই শুয়ে রয়েছো কেন?

—ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

—তোমাদের যে কী হয়েছে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ওদিকে মা সকাল থেকে একরকম শুয়ে রয়েছেন। আর এদিকে তুমি শুয়ে আছো; বলছো মাথার যন্ত্রণা।

—সত্যি স্বপ্না! আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন দপ্ দপ্ করছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যেন আমার সব কিছুই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ভীতকণ্ঠে স্বপ্না বললে—কেন অমন করছো দাদা। বাড়ীতে বিয়ে। বাবা একা একা আর ক'দিক সামলাবেন বলো।

শ্যামল কিছু বললে না।

একটু চুপ করে থেকে স্বপ্না বললে—নাও, এবারে উঠে ভালো করে সেজে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করো গিয়ে!

শ্যামল হাসলো! বললো—তুই যা স্বপ্না! আমাকে যদি তোদের সত্যিই কোনো প্রয়োজন থাকে তবে যাবো!

ওদিকে প্রায় বিয়ের লগ্ন উপস্থিত হলো! স্বপ্নাও ব্যস্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শ্যামল উঠে বসলো।

গোধূলি লগ্নে সুশ্বেতার বিয়ে।

বিয়ে আরম্ভ হয়েছে এবার সম্প্রদানের পালা।

এমন সময় বরের বাবা হরিশবাবু কোথা থেকে ঝড়ের মত ছুটে এলেন। নির্মলবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—মশায়, জোচ্চুরী করবার আর জায়গা পেলেন না?

নির্মলবাবু অবাক হয়ে বললেন—কী বলছেন আপনি?

—কী বলবো আবার? সত্যি কথাই বলছি। বলি, আমার জাত-সম্মান সব নষ্ট করবার আপনার কী অধিকার ছিল বলতে পারেন?

—স্পষ্ট করে খুলে বলুন সব কথা।

—ওই মেয়েকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল। তারপর আরও কত কেলেঙ্কারী করার পরে এখানে আপনি জায়গা দিয়েছেন।

নির্মলবাবু বললেন—কী বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না।

—তা পারবেন কেন? মনে করেছিলেন আমরা কিছু জানতে পারবো না। সেই মেয়েই আপনার সংসারে রান্না করে খাচ্ছিল। সব খবরই পেয়েছি মশায়।

একটু চুপ করলেন হরিশবাবু। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন—তাই বুঝি সব গোপন রেখে আমার ঘরে ওই নষ্টা মেয়েকে পার করতে চেয়েছিলেন?

—কোত্থেকে এসব খবর সংগ্রহ করলেন?

—সত্যি কথা চাপা থাকে না।

বলে হরিশবাবু ছেলেকে বললেন—উঠে আয় প্রমথেশ—

নির্মলবাবু অস্থির হয়ে পড়লেন। কাতর কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন—একটি মেয়ের জীবন রক্ষা করুন। আমি আপনাকে সব কথাই খুলে বলবো! আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বিয়েটা হয়ে যাক্। আপনি অনুমতি দিন।

—থাক মশাই, আর অত বক্তৃতা দিতে হবে না। প্রমথ। উঠে আয়। বিয়ে করতে হবে না।

প্রমথেশ মাথা নীচু করে বসেছিল। একবার শুধু ধীরকণ্ঠে বললে— বাবা! একী ভালো কাজ হবে?

হরিশবাবুও সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভেংচিয়ে বলে উঠলেন—বাবা! এখন কি আমাদের এভাবে চলে যাওয়া উচিত?…শীগ্গির চলে আয় বলছি।

পিতার আদেশে প্রমথেশ ধীরে ধীরে উঠে এলো।

হরিশবাবু ছেলে ও দলবল নিয়ে চলে গেলেন।

সুশ্বেতা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল! বরকর্তার কথাগুলো শুনতে পেয়েই ত্রস্তপদে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

এখনো কানে আসছে বরকর্তার কথাগুলো—ওই নষ্টা মেয়েকে তাই বুঝি গোপনে আমার ঘরে তুলে দিতে চাইছো?

নিশ্চল হয়ে গেল যেন ওর সমস্ত শরীরটা।

নষ্টা মেয়ে!

নাঃ, আমাকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল আলমারির সামনে। কাঠের পিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আলমারিটা খুললো। বের করলে সেই মালিশের ওষুধের শিশিটা।

কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর শিশিটা খুলে মুখের কাছে নিতেই হঠাৎ চিত্রিত পিঁড়ির ওপর থেকে মুখ গুঁজে মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

খোলা শিশির মুখ দিয়ে ওষুধটা শাড়ীতে গড়িয়ে পড়লো। শুধু হাতের মুঠোয় শিশিটা থেকে গেল।

এদিকে বর ও বরযাত্রীরা চলে যাওয়ায় সবাই মুষড়ে পড়েছিল। এতক্ষণ সুশ্বেতার কথা মনে হয়নি কারোর।

হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দ শুনে সবাই ছুটে এলো! দেখতে পেলে সুশ্বেতা মাটিতে লুটিতে পড়ে আছে। জীবিত কি মৃত বোঝা যায় না।

ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো।

তখনই ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলো! ডাক্তার এলেন।

নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ।

মন্দাকিনী বুকের ওপর কান পেতে ক্ষীণ স্পন্দন অনুভব করলেন।

ডানহাতের মুঠোটা শক্ত করে বদ্ধ করা। স্বপ্না জোর করে খুলে দিলে।

হাতে নীল শিশি। "পয়জন" লেখা।

ভয়ে কেঁপে উঠলো সবাই।

তবে কি সুশ্বেতা বিষ খেয়েছে?

এ কী করলো সুশ্বেতা!

সকলেই গভীর উদ্বিগ্নভাবে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

ডাক্তারবাবু ভালো করে আবার পরীক্ষা করলেন। বললেন—হয়তো মানসিক অবসাদে খেতে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ খাওয়ার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তাই বুকের কাপড়ে সমস্ত ওষুধটাই পড়ে গেছে।

শ্যামল জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল। ও যেন নিষ্ক্রিয় দর্শক। কোনো কিছু করবার নেই, বলবার নেই।

মন্দাকিনী ছেলেকে ডাকলেন—খোকা!

—মা!—শ্যামল ফিরে দাঁড়ালো!

—এদিকে আয়।

শ্যামল মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো।

সুশ্বেতার তখনও ভালো করে জ্ঞান ফেরেনি। নিমীলিত দুটি চোখ চোখের কোণে অশ্রুজলের ধারা শুকিয়ে আছে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে শ্যামল চোখ ফিরিয়ে নিলো।

মন্দাকিনী আবার ডাকলেন—খোকা!

—কি মা!

—আজ তোকে একটা অনুরোধ করছি, রাখবি বাবা?

—রাখবো।

—তবে এই হতভাগীকে আজ এই শেষ রাতের লগ্নে তোকে বিয়ে করতে হবে।

শ্যামল কিছু বলার আগেই সুশ্বেতার বরফের মত ঠাণ্ডা হাতটা শ্যামলের হাতে তুলে দিলেন মন্দাকিনী।

ঠিক এমনি সময়ে সুশ্বেতা চোখ খুলে তাকালো। এ কে সামনে দাঁড়িয়ে? শ্যামল? তাইতো!

আবার ভয়ার্ত স্বরে চীৎকার করে উঠলো সুশ্বেতা—আমায় তাড়িয়ে দিন, তাড়িয়ে দিন আমায়! আমি অলক্ষুণে—

বলেই আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো সে।

নির্মলবাবু এগিয়ে এলেন। সস্নেহে সুশ্বেতাকে কাছে টেনে এনে বললেন—কেন তাড়িয়ে দেবে। তোর এই বুড়ো ছেলে থাকতে কেউ তোকে তাড়িয়ে দেবে না মা।

সুশ্বেতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নির্মলবাবুর দিকে!

নির্মলবাবু বললেন—আমিই ভুল বুঝেছিলাম তোকে। কিন্তু ভুল হয়নি মন্দাকিনীর, ও ঠিকই চিনেছিল!

দু'চোখে বিস্ময়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকিয়ে থাকে সুশ্বেতা!

মুহূর্তে সারা বাড়ী আবার সরগরম হয়ে ওঠে!

মাঙ্গলিক সানাই আবার বেজে উঠলো! এবার মন্দাকিনী নিজেই সুন্দর করে সেজেগুজে বরণডালা সাজাতে বসলেন!

খুশীতে টল্‌মল্‌ করছেন তিনি।

স্বপ্না মাকে অমন সাজে দেখে হেসে উঠলো। ওর দু'চোখে আনন্দের ঝিলিক। দু'গালে লালিমা। ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

সর্পিল গতিতে সিঁড়িটা দোতলা ছুঁয়ে চলে গেছে। মাঝপথে অনুপের সঙ্গে দেখা।

অনুপ ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো—স্বপ্না। বিয়ে বুঝি হয়ে গেছে? কী করবো, কিছুতেই আগে এসে পৌঁছাতে পারলাম না।

স্বপ্না হাসতে হাসতে বললে—বিয়ে এখনো হয়নি।

—হয়নি! কেন?

—হয়নি। এবার হবে।

—হেঁয়ালী রেখে সত্যি কথা বলো।

—আজকে যে দাদার বিয়ে। মানে, মিলন রাত্রি।

—মিলন রাত্রি!

—হ্যাঁ গো-হ্যাঁ।

—সত্যি বলছো?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে নাকি? চলো, ওপরে চলো। দেখবে আমার মা কেমন বিয়ের কনের মত বেনারসী প'রে বরণডালা সাজাতে বসেছেন।

—চলো যাই।

অনুপের হাত ধরে স্বপ্না উপরে উঠতে লাগলো।

উপরে উঠে অনুপ আশ্চর্য হয়ে গেল। একী, মন্দাকিনী আজ অমন সাজে?

অনুপ বললে—কনে কে! অমিতা তো?

স্বপ্না স্বামীর দিকে তাকিয়ে দু'চোখে অনুরাগের প্রদীপ জ্বেলে বললে—না, বিয়ের কনে বদল হয়ে গেছে।

—কে?

—অমিতা নয়, সুশ্বেতা।

অনুপ খুশী হয়ে বললে—আমার মনের ইচ্ছাটাও কিন্তু এই ছিল স্বপ্না।

কৃত্রিম রাগতকণ্ঠে স্বপ্না বললে—তবে এতদিন ভালোমানুষটি সেজেছিলে কেন ?

—তোমার ভয়ে।

হেসে উঠলো স্বপ্না খিল্ খিল্ করে।

অনুপ স্বপ্নাকে কাছে টেনে নিলো।

মুহ্যমান বাড়ীটা আবার হৈ-হট্টগোলে গম্ গম্ করতে লাগলো। চারদিকে ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেল।

বিয়ের আসর নতুন করে সাজানো হয়েছে।

পুরোহিত গম্ভীর স্বরে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করলেন।

ঘন ঘন উলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দে সারা বাড়ীটা মুখর হয়ে উঠলো।

শেষ